লেখক পরিচিতি

লেখকের নাম ঃ হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল জলিল। আক্বিদা বিশ্বাসে সুন্নী, মাযহাবে হানাফী এবং তরিকায় ক্বাদেরী। **পিতার নাম ঃ** মুন্সী আদম আলী মোল্লা। **মাতার নামঃ** মালেকা খাতুন।

জন্ম ঃ ২৬শে ভাদ্র, শনিবার-১৩৪০ বাংলা। চার বোন ও ছয় ভাইয়ের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ।

জন্ম স্থান ঃ গ্রাম আমিয়াপুর, পোঃ পাঠান বাজার, থানা মতলব, জিলা চাঁদপুর। দিল্লীর প্রখ্যাত বুজুর্গ ফেকাহবিদ আলিম এবং বাদশাহ আলমগীরের ওস্তাদ হযরত মোল্লা জিয়ুন (রহঃ) ছিলেন লেখকের বংশের পূর্ব পুরুষ।। হযরত মোল্লা জিয়ুন (রহঃ) রচিত ফেকাহ নীতি শাস্ত্র নূরুল আনওয়ার গ্রন্থখানী দুনিয়াব্যাপী সমাদৃত এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ফাজিল জামাতের পাঠ্য কিতাব। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী জনতা বিদ্রোহের কারণে ইংরেজ কর্তৃক মুঘল সালতানাতের পতনের পর হযরত মোল্লা জিয়ুন (রহঃ) এর বংশধরগণের একটি শাখা প্রাণভয়ে তৎকালীন ত্রিপুরা বর্তমান কুমিল্লার ময়নামতিতে হিজরত করে চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বসবাস গড়ে তুলেন। কালক্রমে ঐ বংশই বর্তমান আমিয়াপুর গ্রামে এসে নেছা বিবির সম্পত্তি ক্রয় করে বসবাস করতে থাকেন। (পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।)

শিক্ষা দীক্ষা ও কর্মজীবন ঃ লেখক প্রথমে মক্তবে কুরআন মজিদ ও কিছু কিতাব শিক্ষা করেন। ৪র্থ শ্রেণী পাস করার পর হিফজ আরম্ভ করেন এবং দু'বছর তিন মাসে হিফজ শেষ করেন। তারপর মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল (হাদীস) ১ম বিভাগে বৃত্তিসহ ১৮৬৪ইং সালে উত্তীর্ণ হন। তারপর ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রি ও এমএ (জেনারেল ইতিহাস) উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগে স্টাইপেন্ডসহ পাস করেন। ১৯৭০ইং সালে আরবী ও জেনারেল শিক্ষা সমাপ্তির পর কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ছাগলনাইয়া কলেজ ও নওয়াব ফয়জুন্নেছা কলেজে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেন। উচ্চতর শিক্ষা লাভের পাশাপাশি জিবীকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শহরে ১৯৬৪-৭৮ইং হযরত তারেক শাহ (রহঃ) দরগাহ মসজিদে ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপনার ফাঁকে ১৯৭৩ইং সালে ১ বছর অগ্রণী ব্যাংকে প্রভেশনারী অফিসার হিসেবে কাজ করে ইস্তফা দেন। ১৯৭৩ ইং সালে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হাজীগঞ্জ বড় মসজিদে ১৯৭৫ সালে কয়েক মাস ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় চট্টগ্রাম চলে যান। চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে ১৯৭৭ সালে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সালে ঢাকা মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়বিয়া আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে চাকুরী নিয়ে স্থায়ীভাবে ঢাকা চলে আসেন। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯০ইং সাল পর্যন্ত মধ্যখানে ৪ বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ইমাম ট্রেনিং প্রজেক্ট ও ঢাকা বিভাগীয় কার্য্যালয়ে ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে পুনরায় ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে কাদেরিয়া তৈয়বিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মসজিদের খতীব, ওয়াজ নসিহত ও আহলে সন্নাতের নির্বাচিত মহাসচিবের দায়িত্বও পালন করে যাচ্ছেন। বুখারী শরীফসহ তার লিখিত ও সম্পাদিত ১১ খানা গ্রন্থের মধ্যে এ পর্য্যন্ত ৯ খানা প্রকাশিত হয়েছে। রদ্দে বেহেক্তী জেওর ও প্রশ্নোত্তরে আকায়েদ শিক্ষা পাণ্ডুলিপি আকারে আছে।

বিদেশ ভ্রমণ ঃ ১৯৮০ইং সালে প্রথম বিদেশ ভ্রমণ করেন। ভারতের আজমীর শরীফে হযরত খাজা গরবী নওয়াজ (রহঃ) ও বেরেলী শরীফের আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত শাহ আহমদ রেজা খান বেরলভী (রহঃ) এর মাযার শরীফ যিয়ারত করে ফয়েজ ও বরকত লাভ করেন। ১৯৮২ইং সালে ইরাক সরকারের নিমন্ত্রণে বাগদাদে অনুষ্ঠিত মোতামারে ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশী প্রতিনিধি দলের সাথে গমন করেন। সেই সাথে পবিত্র হজ্ব ও যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং বাগদাদ শরীফের গাউসুল আযম (রাদিঃ)-এর মাযারসহ অসংখ্য ওলীর মাযার শরীফ যিয়ারত করেন। ১৯৮৪ইং ও ১৯৮৫ইং সালে দু'বার ইরাক সরকারের আহ্বানে পুনরায় ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন ও সেই সাথে যথাক্রমে হজ্জ ও ওমরাহ পালন করেন। বর্তমানে অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি ছুন্নী গবেষণা ও লেখালেখির কাজে ব্যস্ত আছেন। বাংলাদেশে ছুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠার জন্যে বাতিল ফের্কার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আহলে সুন্নাতের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকার শাহজাহানপুরে ১১তলা বিশিষ্ট (প্রস্তাবিত) গাউসুল আযম জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। শরিয়ত ও তরিকত প্রচারের কেন্দ্ররূপে উক্ত মসজিদ গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন মানত পূরণের ভিত্তিতে মানুষের সেচ্ছা অনুদানের ওপর মসজিদের উন্নয়ন কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আল্লাহ কবুল করুন। আমীন !

তারিখ ঃ ২৫ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ইং

আহকামুল মাজার

(মাজারের বিধান)

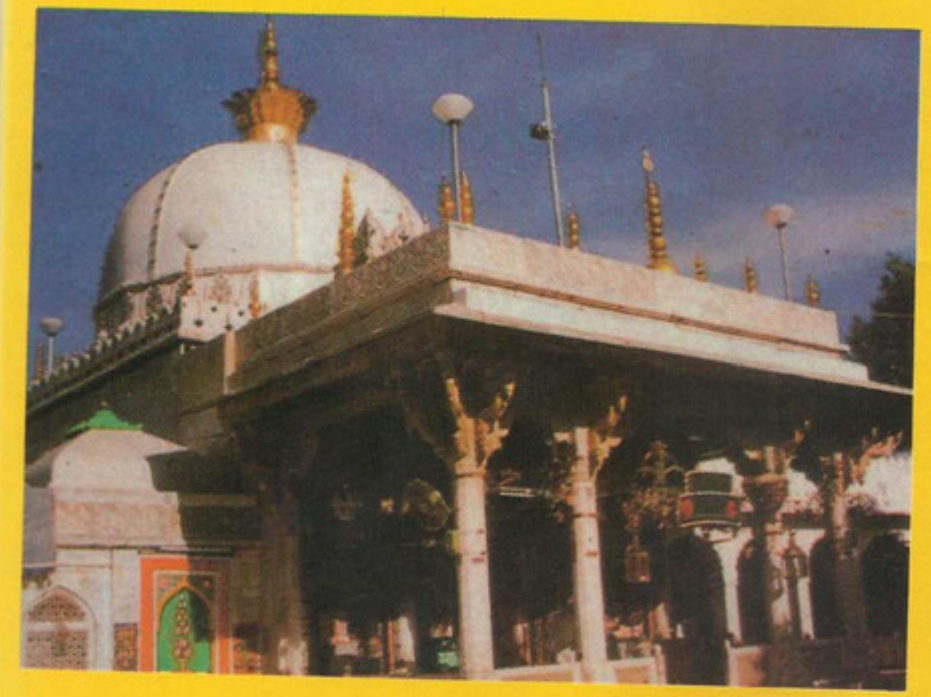

খাজা মুঈনউদ্দিন চিশতি আজমিরী (রঃ)-এর মাজার শরীফ

অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল জলিল

সৌজন্য কপি

জনাব

সাইফুদ্দিন হোসাইন

এম এ জলিল
৬/৪/৯৭ইং

اَحْكَامُ الْمَزَارْ

আহকামুল মাজার

(মাজারের বিধান)

প্রণেতা ঃ
অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলিল
এম, এম, এম, এ, বিসিএস
[redacted] অধ্যক্ষ ঃ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলীয়া মাদ্রাসা
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
মহাসচীব ঃ আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামাআত
প্রাক্তন ডিরেক্টর ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন,
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ঠিকানা ঃ ছুন্নী গবেষণা কেন্দ্র
১০/২৯ তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭। ফোন ঃ ৯১১১৬০৭

উৎসর্গ

ওলিকুলের সম্রাট গাউসুল আ'জম, বড়পীর হযরত ছৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহু এবং সুলতানুল হিন্দ আতায়ে রাসুল হযরত ছৈয়দ খাজা মুঈনে উদ্দিন চিশ্‌তী ছুম্মা আজমিরী রাদি আল্লাহু আনহু-এর পাক দরবারে, "আহকামুল মাজার" গ্রন্থখানী কবুলিয়তের জন্য উৎসর্গ করা হ'ল।

বিনীত খাকছার
মুহাম্মাদ আবদুল জলিল
এম, এম, এম, এ, বিসিএস

প্রকাশকঃ
মুহাম্মদ নুরুল আলম নোমান
নোমান প্রকাশনী
৬৪৩, বড় মগবাজার।
ঢাকা-১২১৭,
ফোন ঃ ৪১৬৬১২।

প্রথম প্রকাশকাল ঃ ২৪শে শাওয়াল, ১৪১৭ হিজরী
৩রা মার্চ ১৯৯৭ ইংরেজী
২০শে ফাল্গুন ১৪০৩ বাংলা।

কম্পিউটার কম্পোজঃ
নোমান এন্টারপ্রাইজ
(কম্পিউটার কম্পোজ এন্ড ট্রেনিং)
৬৪৩, বড় মগবাজার।
ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ৪১৬৬১২।

প্রাপ্তি স্থান ঃ
১। ছুন্নী গবেষণা কেন্দ্রঃ
১০/২৯, তাজমহল রোড,
মোহাম্মদপুর ঢাকা-১২০৭
২। গাউসুল আজম জামে মসজিদ
উত্তর শাহজাহান পুর, ঢাকা
৩। নোমান প্রকাশনী, ৬৪৩, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ৪১৬৬১২
৪। খন্দকার প্রকাশনী, বাংলাবাজার।
৫। সিদ্দিকীয়া লাইব্রেরী, মিত্র বাজার।
রাধাপুর, লক্ষীপুর।

প্রেসঃ

হাদীয়া ঃ সাদা ঃ ৪০

"AHKAMUL MAZAR" Writen BY Principal Hafiz Mawlana Muhammad Abdul Jalil, Former Director Islamic Foundation Bangladesh, Secretary General: Ahlesunnat Wal Jamaat, Bangladesh & Published by Mohd. Nurul Alam Noman of Noman Prokashani

Price : Taka 40, Us $ 2.

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা নং

০১। পেশ কালাম.....৫
০২। শানে আউলিয়া.....৮
০৩। গ্রন্থ রচনার পটভূমিকা.....১২

প্রথম অধ্যায়

০৪। শরীয়ত মতে উরস জায়েজ ও উত্তম কাজ.....১৫
০৫। উরস নামের তৎপর্য.....১৫
০৬। উরস এর প্রকৃতি বা হাকিকত.....১৬
০৭। উরস শরীফ জায়েজ হওয়ার দলীল ও প্রমানাদি.....১৭
০৮। উরস বিরোধীদের কতিপয় আপত্তি ও তার জওয়াব.....২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

০৯। মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ ও সুন্নাত.....৩১
১০। মাজার জিয়ারত সম্পর্কে ভ্রান্ত মতামত খণ্ডন.....৩৮

তৃতীয় অধ্যায়

১১। আউলিয়া কেরামের মাজারের উপর ছাদ ও গম্বুজ নির্মাণ করা, মাজার পাকা করা ও চর্তুপার্শে দেওয়াল নির্মাণ করা জায়েজ ৪৬

চতুর্থ অধ্যায়

১২। মাজারে মোমবাতি জ্বালানো এবং আলোক সজ্জা করা জায়েজ ৫০

পঞ্চম অধ্যায়

১৩। মাজারে গিলাফ দ্বারা আবৃত করা, মাজারে ফুল দেয়া ও আতর গোলাপ ছিটানো জায়েজ ৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
ষষ্ঠ অধ্যায়	
১৪। মাজার চুম্বন করা এবং মাজার প্রদক্ষিণ করা জায়েজ	৫৬
সপ্তম অধ্যায়	
১৫। অলী আল্লাহগণের নিকট রূহানী সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েজ	৫৮
অষ্টম অধ্যায়	
১৬। আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারে বা তাদের নামে মান্নত করা জায়েজ	৬২
নবম অধ্যায়	
১৭। জিয়ারত ও বরকত লাভের উদ্দেশ্য মহিলাদের মাজারে গমন করা জায়েজ	৬৪
দশম অধ্যায়	
১৮। মাজার জিয়ারতের নিয়ম, মাজার মুখী হয়ে মুনাজাত ও ওলীগণের উছিলাধরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা জায়েজ ও সুন্নাত। বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্ন ও জবাব।	৬৭
১৯। হযরত নবী করীম (দঃ)-এর-রওজা মোবারক জিয়ারতের নিয়ম	৬৮
২০। হযরত নবী করীম (দঃ)-কে "ইয়া রাসূলাল্লাহ" বলা, নবীর নিকট প্রার্থনা করা, নবীর নিকট শাফায়াত প্রার্থনা করা, মাজার জিয়ারতকালে হাত বাধা জায়েজ	৭২
২১। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর মাজার জিয়ারতের নিয়ম	৭৩
২২। হযরত ওমর (রাঃ) -এর মাজার জিয়ারতের নিয়ম	৭৪
২৩। আল্লাহর অলীদের মাজার জিয়ারতের নিয়ম ঃ তাদের ছালাম দেয়া ও সম্বোধন করা জায়েজ	৭৭
২৪। মাজার জিয়ারতকালে কোন দিকে মুখকরে মুনাজাত করতে হবে?	৭৮

احكام المزار

আহকামুল মাজার

(মাজারের বিধান)

পেশ কালাম

মুসলিম বিশ্বে অসংখ্য নবী ও অলীদের (কবর) মাজার শরীফ বিদ্যমান। এসব মাজার ইসলামের এক বিরাট ইসলামী নির্দশন। এসব মাজার জিয়ারত করে মুসলমানগণ হিদায়াত প্রাপ্ত হন। এগুলো মুসলমানদের মিলন ক্ষেত্র ঐক্যের প্রতীক। আমরা তাঁদেরকে চোখে দেখিনি। মাজারসমূহ দর্শন করে বিদগ্ধ মন শান্তিলাভ করে। আত্মার শক্তি বৃদ্ধিতে এসব মাজার জিয়ারত, চুম্বকের ন্যায় কাজ করে। পরকালের স্মৃতি মানস পটে ভেসে উঠে। আত্মার সাথে আত্মার সংযোগ ঘটে। তাই নবী করিম (দঃ) তাঁর রওজা মোবারক ও অন্যান্য মাজার ও কবর জিয়ারতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হাদীস শরীফে নবীজীর রওজা মোবারকের জিয়ারতের ফজিলত বর্ণনা করে এরশাদ করেন ঃ

مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ

(মান যারা ক্বরী ওয়াজাবাত লাহু শাফায়াতী)

অর্থাৎ— "যে ব্যক্তি আমার ক্বর (রওজা) মোবারক জিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে"।—(আল হাদীস)

অন্যান্য ক্বর (মাজার) জিয়ারত সম্পর্কে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

كنت نهيتكم عن زيارة القبور . الافزوروها فانها تذكر الاخرة

—"আমি প্রথম দিকে তোমাদেরকে কবর (মাজার) জিয়ারত করতে নিষেধ করতাম। (কেননা এসম্পর্কে আমার কাছে তখনও ওহী আসে নাই)। এখন বলছি, তোমরা কবরসমূহ জিয়ারত কর। কেননা, কবর জিয়ারত পরকালকে স্মরণ করিয় দেয়"। —(আল হাদীস)

আল্লাহ পাক তাঁর গজবে পতিত স্থান ও জনপদগুলো ভ্রমন করার জন্য কুরআন মজিদে নির্দেশ করেছেন। যথা—

قل سيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

"হে প্রিয় রাসূল! আপনি বলে দিন, তোমরা পৃথিবীময় ভ্রমণ করে দেখো, মিথ্যা প্রতিপন্যকারীদের পরিনাম কত ভয়াবহ হয়েছিল"।—(আল কুরআন)

অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা ঐ সব দিনগুলোকে স্মরণ করতে বলেছেন, যে দিনগুলোতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর অপার অনুগ্রহ করেছেন। যেমন হযরত আদমের তৌবা, নূহের নাজাত, অগ্নিকুণ্ড হতে ইবরাহীমের মুক্তি, মুছার নীলনদ অতিক্রম, আইউবের রোগমুক্তি, ঈসার উপর বেহেস্তী খাদ্য নাজীল, আশুরার দিনের ঘটনাবলী, শবে ক্বদরে কুরাআন নাজীল, রাহমাতুল্লীল আলামীনের আগমন দিবস বা মিলাদ দিবস এবং আউলিয়ায়ে কেরামের স্মরণীয় দিনসমূহ ইত্যাদি। এগুলো স্মরণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এরশাদ করেন ঃ

وذكرهم بايام الله + ان فى ذلك لايات لكل صبار شكور

"হে প্রিয় রাসূল! আপনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির দিনগুলো। নিশ্চয়ই ঐগুলোতে রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞজনদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন"। (সূরা ইব্রাহীম আয়াত ঃ ৫)

উক্ত আয়াতের বিশ্লেষণে তাফসীরকারগণ বলেছেন ঃ নবী ও অলীদের উপর যেসব অনুগ্রহ দান করা হয়েছে সেগুলো স্মরণ করা, সেসব স্থান ভ্রমণ করা ও সেগুলোর স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করাও আল্লাহর দিবসসমূহ স্মরণ করার শামিল (তাফসীরে খাজায়েনুল ইরফান)।

খোদার গজব প্রাপ্ত স্থান ও কওমের পরিনাম দর্শনের উদ্দেশ্যে পৃথিবীময় ভ্রমণ করার নির্দেশ যেমন কুরআন মজিদে দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে নেককার ও অনুগ্রহ প্রাপ্তদের দিনসমূহ ও স্থানসমূহ স্মরণ করা, পালন করা এবং তথায় গমন

করার নির্দেশও কুরআন মজিদেই এসছে। সুতরাং আল্লাহর অলীগণের জন্ম-মৃত্যু দিবসসমূহ স্মরণ করা, পালন করা ও তথায় গমন করা সবগুলোই উক্ত আয়াতের মধ্যে শামিল রয়েছে। আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারসমূহ জিয়ারত করা, তাঁদের জন্ম-মৃত্যু স্মরণ করা ও পালন করার লক্ষ্যেই "উরস ও মাজার" প্রসঙ্গে অত্র "আহ্‌কামুল মাজার" গ্রন্থের প্রতিপাদ্য রচিত হয়েছে। জিয়ারত সম্পর্কিত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যেই মাজার সংরক্ষণ ও জিয়ারতের অন্যান্য আনুসঙ্গিক সুবিধাদী প্রদানের প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়।

তাই কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াছের আলোকে মাজারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ইসলামী সমাধানের লক্ষ্যে দশটি অধ্যায়ে অত্র "আহকামুল মাজার" বা মাজারের বিধান গ্রন্থখানী রচিত হলো। বর্তমানকালে মাজার ও উরসের বিরুদ্ধে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে পেট্রো-ডলারের বদৌলতে। বাতিল ফের্কাগুলোর এক নম্বর টার্গেট হচ্ছে অলী আল্লাহদের মাজার ও উরস। তারা মাজারসমূহ ও স্মৃতিচিহ্ন ধ্বংস করার নিমিত্তে, একজোট হয়ে আক্রমন শুরু করেছে। জনসাধারণ অলী ও মাজার ভক্ত হলেও, অসহায়ের মতই তাদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে। ওহাবীরা আরবের মাজারসমূহ ধ্বংস করে এবার বাংলাদেশের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। অজস্র অর্থ আসছে বাংলায় মাজার বিরোধী বই রচনা করার জন্য। বিনামূল্যে অথবা স্বল্প মূল্যে ৫টি বইয়ের সেট বিতরণ করা হচ্ছে। এ তুফান মোকাবেলা করার জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস "আহকামুল মাজার" গ্রন্থখানী। অলীভক্ত, নবী প্রেমিকভাইবোনদের দুয়া ও সহযোগিতা আউলিয়ায়ে কেরামের ফয়েজ ও বরকতই আমার পাথেয়। আমীন, ছুম্মা আমীন।

বিনীত

গ্রন্থকার

শানে আউলিয়া

১। يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আরোও আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে নির্দেশ দানের যোগ্য মহান ব্যক্তিদের" (সূরা নিছা, আয়াত নং ৫৯)

২। يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহর পথে অছিলা তালাশ করো" (সূরাঃ মায়িদা, আয়াত নং ১১৯)

৩। يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সাদিকীনদের (অলীগনের) সঙ্গলাভ করো"-(সূরা ঃ তওবা, আয়াত নং ১১৯)

৪। الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون

"জেনে রেখো! নিশ্চয়ই আল্লাহর অলীগণের ভবিষ্যতের কোন প্রকার ভয় নেই এবং অতীতের জন্যও তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবেন না।" (সূরা ইউনুছ ৬২নং আয়াত)

৫। لازال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى احببته فاذا احببته كنت له سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصربه ويده الذى ياخذ به ورجليه الذين يمشى بهما واذا سألنى شيئا اعطيته (مشكوة شريف)

"আমার বান্দা, নফল ইবাদতের মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। ফলে আমি তাঁকে মুহাব্বত করতে থাকি। যখন সে আমার মুহাব্বতের পাত্র হয়ে যায়, তখন আমি তাঁর কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমি তাঁর চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তাঁর হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তাঁর পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। যখন সে আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাঁকে সে জিনিস দিই" ।-(হাদীসে কুদ্ছী, মিশকাত শরীফ)

৬। عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب

اشعث اغبر مدفوع عن الابواب لواقسم على الله لابره - (رواه مسلم)

"হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেছেন, এমন অনেক উসকো খুশখো চুল ও ধূলা মলীন বিশিষ্ট লোক আছে, যাদেরকে মানুষের দরজা হতে বিতাড়ন করা হয়; অথচ তাঁরা যদি আল্লাহর কাছে কিছু দাবী করে বসে, তাহলে আল্লাহ্ তাদের সে দাবী পূরণ করেন"- (মুসলিম শরীফ)

৭। من عادلى وليا فقد اذنته بالحرب

"যে ব্যক্তি আমার অলীর সাথে শত্রুতা করে, আমি তাকে যুদ্ধের জন্য আহবান জানাই"- (মিশকাত শরীফ)

৮। عن على كرم الله وجهه قال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الابدال يكونون بالشام وهم اربعون رجلا كلما مات رجل ابدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الاعداء ويصرف عن اهل الشام بهم العذاب (مشكوة)

"হযরত আলী (কঃ ওয়াজঃ) বর্ণনা করেন, আমি নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি যে, সিরিয়ায় চল্লিশ জন আবদাল হবেন। তাঁদের মধ্যে কেউ ইনতিকাল করলে অন্য লোক দিয়ে আল্লাহ সে স্থান পূরণ করেন। তাঁদের উছিলায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়; শত্রুদের উপর তাঁদের উছিলায় বিজয় লাভ হয় এবং তাঁদের উছিলায়ই সিরিয়াবাসীদের উপর থেকে আজাব দূরিভূত হয়"- (আল-হাদীস, মিশকাত)

৯। عن عبد الله بن مسعود ان لله تعالى ثلثمائة نفس على قلب ادم وله اربعون قلوبهم على قلب موسى وله سبعة قلوبهم على قلب ابراهيم عليه السلام وله خمسة قلوبهم على قلب جبرائيل وله ثلثة قلوبهم على قلب ميكائيل وله واحد قلبه على قلب اسرافيل كلما مات الواحد ابدل الله مكانه من الثلثة وكلما مات الواحد من الثلثة ابدل الله مكانه من الخمسة وكلما مات الواحد من الخمسة ابدل الله مكانه من السبعة وكلما مات الواحد من السبعة ابدل الله مكانه من

الاربعين وكلمامات الواحد من الاربعين ابدل الله مكانه من الثلثماة وكلمامات الواحد من الثلثماة ابدل الله مكانه من العامة بهم يدفع البلاء عن هذه الامة رواه ابن عساكر مرفوعا (مرقات)

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হতে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম -এর হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ আল্লাহ তায়ালার এমন তিনশত জন খাস বান্দা রয়েছেন যাদের কলব (হাল) হযরত আদম আলাইহিছ ছালামের কলবের উপর প্রতিষ্ঠিত। আরও চল্লিশজন আছেন, যাদের কলব হযরত মুছা আলাইহিছ ছালামের কলবের উপর প্রতিষ্ঠিত। আরও সাতজন আছেন যাদের কলব হযরত ইবরাহীম আলাইহিছ ছালামের কলবের উপর প্রতিষ্ঠিত। আরও পাঁচজন আছেন যাদের কলব হযরত জিবরাঈল আলাইহিছ ছালামের কলবের উপর প্রতিষ্ঠিত। আরও তিনজন আছেন যাদের কলব হযরত মিকাইল আলাইহিছ ছালামের কলবের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। আরও একজন আচেন যার কলব হযরত ইসরাফীল আলাইহিছ ছালামের কলবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

উক্ত ৩৫৬ জনের মধ্যে সর্বোচ্চজন ইনতিকাল করলে, আল্লাহ তায়ালা নিম্নস্থ তিনজন থেকে ঐ স্থান পূরণ করেন। তিনজনের মধ্যে একজন ইনতিকাল করলে পাঁচজন থেকে, পাঁচজনের কেউ ইনতিকাল করলে সাতজন থেকে, সাতজনের কেউ ইনতিকাল করলে চল্লিশজন থেকে, চল্লিশজনের কেউ ইনতিকাল করলে তিনশতজন থেকে এবং তিনশতজনের কেউ ইনতিকাল করলে, সাধারণ অলীগণের মধ্য হতে উপরের স্থানসমূহ পূরণ করেন। তাঁদের উছিলায়ই আমার এই উম্মতের বালা মুসিবত দূর করা হয়ে থাকে"-(ইবনে আছাকির ও মিরকাত)

১০। اذا تجردت النفوس القدسية من العلائق البدنية اتصلت الى الملاء الاعلى وتسير فى اقطار السموات والارض حيث تشاء وترى وتسمع الكل كالمشاهد (مرقات وتيسير) للعلامة الملا على القارى والعلامة المناوى

"যখন পবিত্রাত্মা ও পুন্যাত্মাগন শারিরীক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান তখন উর্দ্ধ জগতের ফিরিস্তাদের সাথে মিশে যান এবং আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। তাঁরা চাক্ষুস ব্যক্তিদের ন্যায় সবকিছু দেখতে ও শুনতে পান"-(মোল্লা আলী ক্বারীর মিরকাত ও আল্লামা মানাভীর তাইছির)

১১। من نادنى باسمى فى كربة كشفت ومن استغاث بى فى شدة

فرجت ومن توسل بى الى الله فى حاجة قضيت (بهجة الاسرار)

"যে ব্যক্তি আমার নাম ধরে ডাক দিয়ে পেরেশানীতে সাহায্য চাইবে, তার পেরেশানী দূর হবে। আর যে ব্যক্তি কঠিন বিপদে পড়ে আমার সাহায্য প্রার্থনা করবে, তার বিপদ দূর হবে। আর যে ব্যক্তি আমার উছিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাইবে, তার বাসনা পূর্ণ হবে।"-(গাউসুল আ'জম আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ), বাহ্জাতুল আসরার)

১২। ان السعداء والاشقياء ليعرضون على عينى فى اللوح المحفوظ وعزة ربى لانى غائص فى بحار علم الله (بهجة الاسرار)

"সব নেককার ও বদকার আমার দৃষ্টিতে ভাসমান। আর আমার দৃষ্টি লওহে মাহ্ফুজে। আমি আল্লাহর এলেমের সমুদ্রের ডুবুরী"। (ঐ বাহ্জাতুল আসরার)

১৩। قال السيد جمال مكى فى فتاواه سئلت عمن يقول فى الشدائد يارسول الله اويا شيخ عبد القادر الجيلانى شيأ لله اوياعلى هل هو جائز ام لا فقلت نعم هو امر مشروع وشئ مرغوب لاينكره الامتكبر اومعاند وهو محروم عن فيوض الاولياء الكرام وبركاتهم

"সৈয়দ জামাল মক্কী তার এক ফতোয়ায় বলেনঃ আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি কঠিন বিপদে পড়ে রূহানী সাহায্যের আশায় 'ইয়া রাসূলাল্লাহ', অথবা 'ইয়া শেখ আবদুল কাদের শাইয়ান লিল্লাহ', অথবা "ইয়া আলী' বলে ডাক দেয়া জায়েজ কিনা? তদুত্তরে আমার মত হচ্ছে, এরূপ সাহায্য চাওয়া শরীয়ত মোতাবেক জায়েজ ও উত্তম কাজ। অহংকারী অথবা শত্রু ব্যতিত কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না। সে ব্যক্তি নিশ্চয় আউলিয়ায়ে কেরামের ফয়েজ ও বরকত থেকে বঞ্চিত"-সৈয়দ জামাল মক্কী (মক্কার মুফতী)

১৪। "আল্লাহর এলেমে এমন কিছু তাকদীর আছে, যা কোন কারণে পরিবর্তন হতে পারে। এমন তাকদীর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার অলৌকিক ক্ষমতা আল্লাহ পাক হযরত গাউসুল আ'জম আবদুল কাদের জিলানীকে (রাঃ) দান করেছেন" -(হযরত মুজাদ্দেদ আল্ফেসানী, মকতুব নং ১২৩, ৩য় খণ্ড)

-ঃ গ্রন্থ রচনার পটভূমিকা ঃ-

বার্মা সরকার স্থানীয় দেওবন্দী ওলামাদের মতামতের ভিত্তিতে বার্মায় অবস্থিত শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের মাজার সহ অন্যান্য অলীগণের মাজার ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় মুলমেন (বার্মা) এ অবস্থিত হযরত শাহ নাসির আহমদ আল-কাদেরী আল আত্তাসী (রহঃ)-এর মাজারও ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উনার মুরিদ তৎকালীনবিএনপি সরকারের যোগাযোগমন্ত্রী অলি আহাম্মদবীর বিক্রম ও মহাখালী মাদ্রাসার সিনিয়র মুদারিরছ মাওলানা আবদুল বাতেন এবং জনৈক উকিল আবদুল মালেক

এবং নাসির আহমদ (রহঃ)- এর পুত্র বর্তমান গদ্দীনশীন শাহ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াছিন সাহেবানগণ মাজার সম্পর্কীত একটি ফতোয়া উর্দূতে আমার থেকে লিখিয়ে নেন ১৯৮৯ ইং সালে। নাম দেওয়া হয় احكام مزار (আহকামুল মাজার)। এই ফতোয়া বার্মা সরকারের নিকট পেশ করা হলে সরকার মাজার ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকে। শাহ নাসির আহমদ (রহঃ)-এর মাজার এখনও অক্ষত রয়েছে। আল্ হামদু লিল্লাহ! উক্ত উর্দূ ফতোয়ার বাংলা অনুবাদ কিছু সংযোজনী সহ প্রকাশ করা হলো। আল্লাহ অলীগনের উছিলায় আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং মুসলমান ভাইদেরকে উপকৃত করুন। আমিন! বিহুরমাতি সাইয়িদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী আজমাইন।

(হাফেজ মাওলানা) মুহাম্মাদ আবদুল জলিল

(এম এম, এমএ. বিসি এস) অধ্যক্ষ, কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, মোহাম্মদ পুর ঢাকা- ১২০৭ সাবেক ডিরেক্টর- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ;মহা সচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।

তাং ৩রা শাওয়াল ১৪১৬ হিজরী ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ইংরেজী, ১১ই ফাল্গুন, ১৪০২ বাংলা ।

আহ্‌কামুল মাজার

বখেদমতে হযরতুল আল্লামা হাফেজ মাওলানা আবদুল জলিল সাহেব,

অধ্যক্ষ, কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

প্রশ্ন ঃ নিম্নলিখিত মাস্‌আলা সমূহ সম্পর্কে শরিয়তের মুফতিগণের রায় কি? কুরআন, সুন্নাহ, ইজ্‌মা ও কিয়াছের আলোকে সমাধান দিতে হুজুরের মর্জি হয়।

১। উরস শরীফ জায়েজ কিনা? কোন সাহাবীর উরস পালন করা হতো কিনা? উরস শরীফ ও ইসালে সাওয়াবের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা?

উরস বিরোধীগণের দলীল যদি থাকে, তাহলে তার জবাব কি?

২। মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর দেশে সফর করা জায়েজ কিনা? জিয়ারত বিরোধীদের দলীলের জবাব কি?

৩। আউলিয়ায়ে কেরামের মাজার পাকা করা, ছাদ ও গম্বুজ তৈরী করা এবং চতুষ্পার্শে দেয়াল দেয়া জায়েজ কিনা?

৪। মাজারে বাতি জ্বালানো অথবা আলোক সজ্জা করা জায়েজ কিনা?

৫। মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পন, গিলাফ চড়ানো ও আতর গোলাব ছিটানো জায়েজ কিনা?

৬। বরকত লাভের জন্য ভক্তি করে মাজার চুম্বন করা এবং মাজার থেকে ফয়েজ লাভের উদ্দেশ্যে মাজারের চতুষ্পার্শে নিছবতের তাওয়াফ করা বা মাজার প্রদক্ষিন করা জায়েজ কিনা?

৭। আউলিয়ায়ে কেরামের নিকট রুহানী সাহায্য চাওয়া অর্থাৎ ইস্‌তিমদাদ, ইস্‌তিগাছা ও ইস্‌তিয়ানাত জায়েজ কিনা?

৮। অলী-আল্লাহ্ গনের উদ্দেশ্যে বা তাদের নামে মান্নত করা জায়েজ কিনা?

৯। ফয়েজ ও বরকত লাভের জন্য অথবা জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারে মেয়েলোকদের গমন করা ও সফর করা জায়েজ কিনা?

১০। মাজার জিয়ারতের নিয়ম কি? মুনাজাত ও দুয়া কোন্ দিকে ফিরে করতে হবে? মাজার বাসীর কাছে কিছু চাওয়া জায়েজ কিনা? কোন্ নিয়মে চাইতে হবে?

আরজ গুজার,

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসিন,

১৭৬/এ, এপারমেন রোড, মূলমেন, বার্মা।

জবাব

আল্লাহ তায়ালার জন্য অজস্র প্রশংসা, যিনি কোরান সুন্নাহর আলোকেউত্তম প্রথা আবিস্কারককে সম্মানিত করেন এবং নিকৃষ্ট প্রথা আবিস্কারককে লাঞ্চিত ও অপমানিত করেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর উপর, যিনি কোরান সুন্নাহর ভিত্তিতে উত্তম প্রথা প্রচলনকারীর জন্য দুইটি পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। একটি হচ্ছে – উত্তম প্রথা আবিস্কারের এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে উক্ত প্রথা অনুযায়ী আমলকারীদের সমপরিমান সাওয়াব। আর অনুরূপভাবে মন্দ প্রথা প্রচলনকারীর জন্যও দুইটি শাস্তির কথা তিনি ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁরপরে আর কোন নবী আসবেন না এবং তাঁর ঘোষণাই চূড়ান্ত ঘোষণা! প্রশ্নকারী হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসিন সাহেব (বার্মা) উপরোক্ত ১০ টি বিষয়ে প্রশ্ন রেখেছেন এবং শরীয়ত অনুযায়ী দলীল ও প্রমানাদি সহ মুফতী গণের ফতোয়া তলব করেছেন। তাঁর জিজ্ঞাসা অনুযায়ী উক্ত ১০টি বিষয়ই শরীয়ত সম্মতভাবে মুফতীগণের ফতোয়া অনুযায়ী জায়েজ ও বৈধ এবং উত্তম। একমাত্র অহঙ্কারী অথবা হঠকারী ব্যক্তি ছাড়া এগুলো কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা। আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে প্রশ্নের ক্রম অনুসারে ১০টি অধ্যায়ে জবাব প্রদান করা হলো।

অধম

মুহাম্মদ আবদুল জলিল।

প্রথম অধ্যায়

শরীয়ত মতে উরস জায়েজ ও উত্তম কাজ

উরস অধ্যায়ে আমরা দু'টি বিষয়ে আলোকপাত করবো, প্রথম পর্বে আমরা উরসের বৈধতা প্রমাণ করবো এবং দ্বিতীয় পর্বে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ হতে পবিত্র উরসের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি প্রমাণ খাড়া করা হয়েছে, সেগুলোর জবাব দেয়ার চেষ্টা করবো- ইন্‌শা আল্লাহ।

১। প্রথম পর্বঃ উরস শরীফ উত্তম কাজঃ

উরস শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ হলো বিবাহ-শাদী। এ কারনেই নব দম্পতিকে আরবীতে উরূস বা দুলা দুল্‌হান বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় বুজুর্গানে দ্বীনের ওফাত দিবসকে ইয়াউমূল উরস বলা হয়। কেননা,ঐ দিনে তাঁরা আশেক বা প্রেমিক হয়ে কবরে আপন মাশুক বা প্রেমাস্পদ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর দীদার লাভ করে নয়ন তৃপ্ত করেন। ঐ দিনটি প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মিলনের দিন। দুলা দুল্‌হানের মিলনের দিনকেও একারনেই ইয়াওমূল উরূস বলা হয়। যেহেতু সেদিন চিরদিনের লালিত ভাল বাসার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে এবং তৃপ্তির পরিসমাপ্তি হয়। তেমনিভাবে অলী-আল্লাহগণ ও দুনিয়াতে এশ্‌কে রাসুলের প্রেমানলে জ্বলে পুড়ে অবশেষে আপন মাহবুব ও প্রেমাস্পদের মিলন লাভ করেন কবরেও মাজারে এবং চরম তৃপ্তিলাভ করে তাঁরা সুখ নিদ্রায় বিভোর হয়ে পড়েন।

উরস নামের তাৎপর্যঃ মিশকাত শরীফের "আযাবুল কবর" অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন, "যখন মনকির নকীর ফেরেস্তাদ্বয় মৃতব্যক্তিকে কবরে তিনটি প্রশ্ন করে ঈমানের পরীক্ষা নেবে এবং মৃত ব্যক্তি সঠিক উত্তর দিবে- যার শেষ প্রশ্নটি হবে এরূপ "তোমার সামনে হাজির এই মহান প্রেরিত পুরুষ (দঃ) সম্পর্কে তোমার কেমন ধারণা ছিল"? তখন নেককার ও অলী ব্যক্তিরা বলবে "ইনিই আমার প্রিয় রাসূল।" একথা শুনে ফেরেস্তাদ্বয় বলবে-

نم كنومة العروس التى لا يوقظه الا احب اهله اليه

(مشكوة)

"এখন থেকে তোমরা নব-দম্পতির ন্যায় এমন সুখের নিদ্রা যেতে থাকো, যে নিদ্রা থেকে ঘনিষ্ট প্রিয়জন ছাড়া অন্য কেউ জাগাবেনা"

উক্ত হাদীসে কয়েকটি জিনিস প্রনিধান যোগ্য।

প্রথমতঃ অলী ও মোমেন গণকে কবরে নব দম্পতির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ নব দম্পতির ন্যায় নিচ্ছিদ্র সুখ-নিদ্রা যাপন করা যা থেকে কেবল আপন প্রিয়তমই নিদ্রাভঙ্গ করাতে পারে - অন্য কেউ নয়।

তৃতীয়তঃ সুখের তৃপ্ত জীবন লাভ করা– যা নষ্ট করার অধিকার আপন প্রেমাস্পদ ছাড়া অন্য কারুর নেই। অলী– আল্লাহগণ সম্পর্কে উরস শব্দটি উপমা বা রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। সুতরাং উক্ত শব্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই ইসলামী পরিভাষায় অলীগণের ওফাত দিবসকে উরস দিবস বলা হয়ে থাকে। এর বিরোধিতা করা মানেই রাসূলের ব্যবহৃত শব্দের সাথে বেয়াদবী করা। ওফাত দিবসে কবরের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রেমাস্পদ ও দোনো আলমের দুলা হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (দঃ) -এর দীদার লাভ করা কত বড় সৌভাগ্যের বিষয়, প্রেমিক ছাড়া কে বুঝবে এর তত্ত্বকথা এবং অন্য কোন ব্যক্তি আস্বাদন করবে এ প্রেমরস? সুতরাং অলী– আল্লাহগণের মৃত্যু দিবসকে উরস দিবস হিসেবে আখ্যায়িত করার মূল রহস্য এখানেই এবং উরসের মূল দলীল হচ্ছে এই হাদীস খানা।

উরস এর প্রকৃতি বা হাকিকত ঃ প্রতি বৎসর অলীগণের ওফাত দিবসে বা ওফাত উপলক্ষ্যে অন্য যে কোন দিনে সম্মিলিত ভাবে মাজার জিয়ারত করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, জিকির আজকার করা, ওয়াজ নসিহত করা এবং সদ্‌কা খয়রাত করাও গরু ছাগল, শিরনী ইত্যাদি রান্না করে এসব নেক কাজের সাওয়াব অলী– আল্লাহ গণের এবং অন্যান্য মূর্দেগাণের রূহে পৌছিয়ে দেয়া বা ইসালে-সাওয়াব করে ফয়েজ লাভ করাকে প্রচলিত পরিভাষায় উরস বলা হয়। এটাই উরসের প্রকৃত রূপ বা হাকিকত। ইসালে সাওয়াবের মধ্যে মৃত ব্যক্তিকে কুরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার , প্রস্তুতকৃত খানা পিনা ও অন্যান্য নেক কাজের সাওয়াব পৌছিয়ে দেয়াই মূখ্য উদ্দেশ্য। অর্থাৎ শেষ মুনাজাতটিই মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু উরসের মধ্যে যাবতীয় কার্যক্রমটিই মুখ্য

বিষয়-অর্থাৎ খানা পিনা তৈরী করা থেকে আখিরী মুনাজাত পর্যন্ত যাবতীয় কার্যক্রমকে উরস বলা হয়। সুতরাং উভয়ের মধ্যে তথ্যগত কোন বিরোধ নেই। পার্থক্য শুধু নামের মধ্যে। তবে উভয়ের মধ্যে অন্য একটি সুক্ষ্ম পার্থক্য আছে। তা হচ্ছে- ইসালে ছাওয়াবের মধ্যে মৃত ব্যক্তিকে শুধু কিছু দান করাই মূখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু উরস শরীফে শুধু দান করা নয় বরং ফয়েজ লাভ করা ও উদ্দেশ্য থাকে। সুতরাং ইসালে সাওয়াব ও উরস শরীফের মধ্যে উক্ত সুক্ষ পার্থক্যটি অনুধাবন করতে অক্ষম আলিম বা অজ্ঞ ব্যক্তিরাই উরস শরীফের বিরোধিতা করে থাকেন। আল্লাহ সকলকে সুমতি দান করুন। উরস এবং ইছালে ছাওয়াবের নিয়ম পদ্ধতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু তাৎপর্যগত দিক দিয়ে উভয়টি ভিন্ন। ইছালে ছাওয়াব অর্থ কিছু দেওয়া; আর উরস অর্থ– কিছুদিয়ে দোয়া পাওয়া।

উরস শরীফ জায়েজ হওয়ার দলীলও প্রমানাদি

১নং দলীলঃ হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ফতোয়ার কিতাব ফতোয়ায়ে শামীর প্রথমখণ্ড "জিয়ারাতুল কুবুর" অধ্যায়ে একটি হাদীস পেশ করা হয়েছে যার বর্ণনা কারী হচ্ছেন ইবনে আবি সায়বা। তিনি বর্ণনা করেন "নবী করীম (দঃ) বৎসরান্তে প্রতি বৎসরই উহুদের যুদ্ধের ময়দানে শহীদান গণের মাজারে গমন করতেন।" তাফসীরে কবীর ও তাফসীরে দুররে মানসুরে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (দঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায় যে, তিনি প্রতি বৎসরই বৎসরান্তে একবার উহুদের শহীদানগণের মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করতেন এবং শহীদানগণকে সালাম করতেন এভাবে "তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের অসীম ধৈর্য্যের বিনিময়ে; এবং পরকালের ঘর কতইনা শান্তি দায়ক।" অনুরূপ ভাবে নবীজীর অনুসরন করে খুলাফায়ে রাশিদীন অর্থাৎ -হযরত আবুবকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুম গণ তাঁদের খিলাফতকালে অনুরূপ ভাবে জিয়ারত করতেন।

উক্ত হাদীসের দ্বারা এবং চার খলিফার কার্য্য বিধি দ্বারা বৎসরান্তে একবার সম্মিলিতভাবে মাজারের জিয়ারত করা উত্তম কাজ বলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো। আমাদের দেশের প্রচলিত মৃত্যু বার্ষিকীর অনুষ্ঠান উক্ত হাদীস দ্বারাই প্রমাণীত। যারা মৃত্যু বার্ষিকী পালনের বিরোধী, তারা প্রকৃত পক্ষে হাদীসে রাসূলেরই বিরোধী। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত নসীব করুন।

হাদীসের মূল এবারত নিম্নরূপঃ

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَام انه كَان يَأْتِىْ قُبُوْرَ الشُّهَدَاء عَلٰى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالْخُلَفَاءُ الْاَرْبَعَةُ هٰكَذَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ـ

অর্থঃ "নবী করিম (দঃ) প্রত্যেক বৎসরান্তে উহুদের শহীদানদের কবরে (মাজারে) গমন করে সালাম দিয়ে বলতেন "তোমাদের ধৈর্যের প্রতিদানে আল্লাহ্ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষন করুন। পরকালের ঘর কতই না উত্তম। এবং চার খলিফা (রাঃ) অনুরূপভাবেই জিয়ারত করতেন।" (তাফসীরে কবির ও দুররে মানসুর)

২নং দলীলঃ শাহ আবদুল আজিজ ইবনে শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী (রঃ) স্বীয় ফতোয়া আজিজিয়ার ৪৫ পৃষ্ঠায় ফতোয়া প্রদান করেছেন যে, "উরস উপলক্ষে অনেক লোক একত্রিত হয়ে কুরআন শরীফ খতম করা ও প্রস্তুত কৃত খানা অথবা শিরনীতে ফাতেহা পাঠ করে, উপস্থিত জনগনের মধ্যে উক্ত খানা বন্টন করে দেয়ার নাম উরস। খাওয়া দাওয়ার প্রথাটি যদিও নবী করীম (দঃ) এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে প্রচলিত ছিল না, কিন্তু বর্তমান কালে কেউ এই ব্যবস্থা করলে তাতে দোষের কিছুই নেই বরং এই সদ্‌কার কারণে মৃত ব্যক্তিগণের দুয়া ও বরকত লাভ হয়। এই কাজটি মুস্তাহাব পর্যায়ভুক্ত। বাতিলপন্থী কোন কোন আলিম মনগড়া একটি অপবাদ দিয়ে থাকে যে, এভাবে ঘটা করে খানা পিনা প্রস্তুত করার মাধ্যমে এই প্রথাকে ফরজ বলে জনগণ মনে করে থাকে। এটা তাদের সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অপবাদ।

শরীয়তে নির্ধারিত ফরজ ব্যতীত অন্য কোন কাজকে কোন মুসলমান ফরজ বলে মনে করেনা। খতমে কুরআন, খাদ্য ও শিরনী বিতরনের মাধ্যমে সাওয়াব পৌছিয়ে কবরবাসীকে সাহায্য করে তাদের দুয়া ও বরকত লাভ করার ব্যাপারে আলিমগণের ইজমা রয়েছে এবং এটা উত্তম কাজ। উরসের জন্য দিন তারিখ নির্দিষ্ট করাকে কেহ কেহ দোষনীয় মনে করলেও এটা যুক্তিতে টেকেনা। কেননা, দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা হয় অন্য কারণে। তাহলো - যে দিন অলি - আল্লাহগণ ইনতিকাল করেন, ঐ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই ওফাত দিবসে উরস করা হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় কারণ হলো- যেন সকলেই ঐ নির্ধারিত দিনে অতি সহজে একত্রিত হতে পারেন। এতে

শরীয়তের কোন আপত্তি নেই। অন্যথায় যে কোন দিন উরস করা যেতে পারে "এতেও দোষের কিছু নেই।" (অনুবাদঃ ফতোয়া আজিজিয়া ৪৫ পৃষ্ঠা ও যুবদাতুন নাছায়েহ)

৩নং প্রমাণ ঃ দেওবন্দের বড় আলিম মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর বংশের পূর্ব পুরুষ হযরত আবদুল কুদ্দুছ গাঙ্গুহী তাঁর খলিফা মাওলানা জালালুদ্দীনকে ১৮২ নং পত্রে লিখেছেনঃ

'اَعْرَاس پِيْرَان بَرْسُنَّت پِيْرَان بِسَمَاع وَصَفَائى جَارِى دَارَنْد'

অর্থাৎ "পীরগণের উরস পীরগণের নির্দেশিত তরিকা মতে ছামাও অন্যান্য পাক পবিত্রতার সাথে চালু রাখবে।"

৪নং প্রমাণঃ দেওবন্দের আলিম মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী ও আশ্রাফ আলী থানবী সাহেবদ্বয়ের পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী স্যাহেব 'ফয়সালা হাফত মাসআলা' নামক স্বীয় পুস্তিকায় উরসের বর্ণনা এভাবে করেছেন ঃ

'فَقِيْر كَا مَشْرَب اِس اَمْر مَيْں يَه هَے كَه هَرْ سَال اَپْنے پِيْر وَ مُرْشِد كِى رُوْحِ مُبَارَك پَرْ اِيْصَالِ ثَوَاب كَرْتَا هُوْں ـ اَوَّل قُرْآن خَوَانِى هُوْتِى هَے اَوْرْ گَاهْ گَاهْ اَگَرْ وَقْت مَيْں وُسْعَت هُوْ تُوْ مَوْلُوْد پَرْهَا جَاتَا هَے پِهَرْ مَا حَضَر كَهَانَا كِهِلَايَا جَاتَا هَے اَوْرْ اُسْكَا ثَوَاب بَخْش دِيَا جَاتَا هَے ـ' (فَيْصَلَهْ هَفْت مَسْئَلَهْ)

অর্থাৎ "এই বিষয়ে অধমের (ইমদাদুল্লাহ) নীতি হচ্ছে- প্রতি বৎসর স্বীয় পীর-মুর্শিদের রুহ মোবারকে ইছালে ছাওয়াব করে থাকি। প্রথমে কুরআন খানী অনুষ্ঠিত হয় এবং সময় সঙ্কুলান হলে কখনও কখনও মীলাদ শরীফও পাঠ করা হয়। অতঃপর উপস্থিত খানা পরিবেশন করা হয় এবং এর সাওয়াব বখশিশ করে দেয়া হয়।" (ফয়সালা হাফ্‌ত মসআলা)

৫নং প্রমাণঃ মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী দেওবন্দী সাহেব মূল উরসকে জায়েজ মনে করেন। তার লিখিত ফতোয়ায়ে রশীদিয়া প্রথম খন্ড কিতাবুল বিদয়াত পৃষ্ঠা ৯২ তে উল্লেখ আছে ঃ

بَهُتْ اَشْيَاء هَيْں كَه اَوَّل مُبَاح تهِيْں پِهَر كِسِى وَقْت مِيْں مَنْع هُو گَئِيْں مَجْلِس عُرْس وَ مَوْلُوْد بِهِى اَيْسَا هِى هَے ـ اَهْل عَرَب ... كَه عَرَب شَرِيْف كِے لُوْگ حَضْرَت سَيِّد اَحْمَد ...

عرس بہت دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ خاص کر علماء مدینہ منورہ
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا عرس کرتے رہے جنکا مزار
شریف احد پہاڑ پر ہے

(فتاوی رشیدیہ جلد اول کتاب البدعات ص ۹۲)

অর্থাৎ "এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো প্রথমে মোবাহ্‌ ও জায়েজ ছিল। কিন্তু পরবর্তী কোন এক সময়ে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। উরস এবং মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠানও এই পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। আরববাসীদের নিকট থেকে জানা গেছে যে, আরব শরীফের লোকেরা হযরত ছাইয়েদ আহমদ বদভী (রহঃ)-এর উরস শরীফ খুব ধুমধামের সাথে পালন করতেন। বিশেষ করে মদিনা মোনাওয়ারার আলিমগণ হযরত আমির হাম্‌যা (রাঃ)-এর উরস মোবারক পালন করতেন– যাঁর মাজার শরীফ ওহোদ পাহাড়ে অবস্থিত" (ফতোয়া রশিদীয়া প্রথম খন্ড কিতাবুল বিদয়াত পৃষ্ঠা নং ৯২)।

মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী দেওবন্দী সাহেব উপরোক্ত এবারতে স্বীকার করেছেন যে, নবী করিম (দঃ)-এর চাচা হযরত আমির হাম্‌যা (রাঃ)- এর উরস শরীফ মদিনা শরীফের উলামায়ে কেরামগণ পালন করে আসছেন। সুতরাং অলি- আল্লাহ গণ ছাড়াও সাহাবীগণের উরস শরীফ যে মদিনা শরীফে প্রচলিত ছিল -এটাও প্রমাণিত হলো।

প্রশ্ন হচ্ছে -এখন বন্ধ হলো কেন? কে বন্ধ করলো? এর কোন বিবরণ রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব উল্লেখ করেননি। শুধু এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, কোন কোন কাজ প্রথমে মোবাহ্‌ ছিল। কিন্তু পরে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। প্রকৃত ঘটনা হলোঃ ১৯২৪ ইংরেজী সালে যখন গোটা আরবে সৌদী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাদ্‌শাহ্‌ আবদুল আজিজের নির্দেশে সমস্ত মাজার শরীফ ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং মাজারসমূহের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। ভারতের খিলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা মুহাম্মাদ আলী বাদশাহ আবদুল আজিজের এসমস্ত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে একটি ৬ সদস্য বিশিষ্ট খিলাফত প্রতিনিধি দল ডাক্তার আনসারী ও মিঃ শোয়াইব - এর নেতৃত্বে আরব দেশে প্রেরণ করেন। তারা ১৯২৫ ও ১৯২৬ ইংরেজী সনে দুইবার আরব গমন করে মাজার ভাঙ্গা ও পবিত্র স্থান সমূহের নিদর্শন ভাঙ্গার ছবি তুলে নিয়ে এসেছেন এবং বিস্তারিত ঘটনা রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। মাওলানা জিয়াউল্লাহ আল-কাদেরী

(রহঃ)-এর লিখিত ওহাবী মায্‌হাব এবং আল্লামা আরশাদুল কাদেরী (জমশেদপুর বিহার)-এর লিখিত তাবলীগী জামায়াত গ্রন্থে এসব ঘটনার বিবরণ বিশদ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অধমের নিকট ওহাবী মায্‌হাব ও তাবলীগী জামায়াত উর্দূ গ্রন্থ দুখানা মৌজুদ আছে।

মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব আরবের বিখ্যাত ওলী হযরত সাইয়েদ আহমদ বদভী (রহঃ)-এর উরস শরীফ শান শওকতের সাথে পালিত হতো বলেও উল্লেখ করেছেন। ওহাবী সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণেই তা বন্ধ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে ওহাবী নজদী শাসনের পতনের পর উক্ত উরস পুনরায় চালু হবে ইন্‌শা আল্লাহ। সুতরাং উরস শরীফ কোন নুতন জিনিস নয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ অতীত ইতিহাস অতি সহজে ভুলে যায়। এই সুযোগে ওহাবীপন্থী আলেমগণ বলে বেড়ায় যে, আরব দেশে কোন মাজার নেই এবং সেখানে কোন উরস শরিফও পালন করা হয় না– ইত্যাদি। অথচ আসল ঘটনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইতিহাস বিকৃতিতে বাঙ্গালীরা বড় ওস্তাদ। উরস শরীফ ও মিলাদ শরীফ প্রথমে আরব দেশে চালু হয়েছে। পরে বাংলাদেশে এসেছে। সৌদী আরবের সুন্নী মুসলমানরা এখনও গোপনে মিলাদ শরীফ কিয়াম সহকারে পাঠ করে থাকেন। এই অধম ১৯৮৫ ইংরেজী সনে ওমরাহ্‌ পালনের সময় বরাতের রাতে মক্কা শরীফের এক আরবীর বাসায় আরও ১৩জন বাংলাদেশী আলেমসহ মিলাদ শরীফ পড়েছি । বাড়ীর মালিক ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে এই মিলাদ শরীফের আয়োজন করেছিলেন এবং অতি উচ্চমানের খানা পিনা তৈরী করেছিলেন। সৌদী আরবের প্রাক্তন তেলমন্ত্রী জাকি ইয়ামানী ছিলেন সুন্নী। তিনি প্রতি বৎসর ঈদে মিলাদুন্নী (দঃ) উপলক্ষে মক্কা শরীফের বাড়ীতে বিরাট মিলাদ মাহফিল ও জিয়াফতের আয়োজন করে থাকেন। একারণেই তাঁকে সৌদী সরকার বরখাস্ত করেছেন।

[illegible] পাক ভারতের ওহাবী আন্দোলনের প্রথম নেতা ইসমাইল দেহলবী তিনি "তাকবিয়াতুল ঈমান" নামক কিতাব লিখে ওহাবী মতবাদ ভারতে ও বাংলাদেশে প্রথম প্রচার করেছিলেন। তিনি শাহ্‌ ওয়ালি উল্লাহর [illegible] ও শাহ্‌ পরিবারের অন্যান্য বুজর্গানে দ্বীনের পথ ও মত থেকে সরে গিয়ে নজদী ওহাবী মতবাদে দিক্ষীত হয়েছিলেন এবং হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মুসলমানদের যাবতীয় অনুষ্ঠানকে শিরক ও বিদয়াত বলে আখ্যায়িত করে এদেশে ওহাবী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে

মুসলমানকে দুভাগে বিভক্ত করে দিয়েছেন। উক্ত ইসমাঈল দেহ্‌লভী তাঁর রচিত বিতর্কিত কিতাব সিরাতুম মুস্‌তাকীম উর্দু সংস্করণ পৃষ্ঠা নং ৫৮-এ উরস -এর বৈধতা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

نَفْسِ عُرْسْ کی اِبَاحَتْ مَیْں کُوْئِی شَکْ نَہِیْں مَگَرْ ہَیْئَتِ کَذَائِیَّہْ
یَعْنِی تَعْیِیْنِ وَقْتْ وَطَعَامْ وَ غَیْرَہْ کِیْوَجْہ سے مَنَعْ ہُوْگئی

অর্থাৎ "মূল উরস শরীফ জায়েজ হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রচলিত নিয়ম- যথাঃ সময় ও তারিখ নির্ধারন, খানাপিনার আয়োজন- ইত্যাদি কারণে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।" (সিরাতে মুসতাকীম পৃষ্ঠা ৫৮ উর্দুসংস্করণ)

৭ নং যুক্তিভিত্তিক প্রমাণঃ উরস শরীফ জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে যুক্তি এবং বুদ্ধি বৃত্তি ও একটি উত্তম দলীল। প্রথমতঃ উরস শরীফ বিভিন্ন উত্তম কাজের সমষ্টিকে বলা হয়। যেমন কুরআন খানী, মাজার জিয়ারত, সদকা খয়রাত, মিলাদ কেয়াম, দোয়া মুনাজাত ও জিয়ারত ইত্যাদি ভাল কাজ সমূহ উরস শরীফের বিশেষ অনুষ্ঠান। এ কাজগুলো পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেকটিই বৈধ ও জায়েজ। সুতরাং সবগুলো কাজ একত্রে এবং একই অনুষ্ঠানে পালন করা অবৈধ হবে কোন্ যুক্তিতে? কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করা, জিয়ারত করা ও সদ্‌কা খয়রাত করা প্রত্যেকটি কাজই পৃথক পৃথক ভাবে সুন্নাত। সুতরাং তিনটি সুন্নাত একত্রে আদায় করা এবং সম্মিলিত ভাবে পালন করা হারাম বলে গন্য হবে কোন্ যুক্তিতে? ওহাবীগণ মনগড়া শর্ত যোগ করে বলে থাকে যে, বৎসরের নিদ্দিষ্ট দিনে একত্রিত হওয়া এবং খানা পিনা তৈরী করা ও ধুমধাম করা নিষিদ্ধ। এগুলো তাদের মনগড়া শর্ত। হাদিসের বা শরীয়তের কোন দলীলে এমন শর্ত নেই। জিয়ারত করার নির্দেশ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। দূরে বা নিকটে একাকী বা একত্রে নির্ধারিত সময় বা অনির্ধারিত সময়ে জিয়ারত করার কোন শর্তই হাদীসে আরোপ করা হয়নি। হাদীস শরীফে শর্তহীনভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ اَلَا فَزُوْرُوْهَا অর্থাৎ 'তোমরা এখন থেকে জিয়ারত করো, যা পূর্বে বিশেষ কারণে আমি নিষেধ করেছিলাম"। সুতরাং শর্তহীন হাদীসকে মনগড়া শর্তাধীন করার মত বড় জুলুম ও অন্যায় আর কি হতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ তারিখ নির্ধারণ করা হয় জনগণের সমাগমের সুবিধার্থে।

তৃতীয়তঃ তারিখ নির্ধারিত থাকলে পীর ভাইগণ একত্রে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। পরস্পরের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় হয়।

চতুর্থতঃ তারিখ নির্ধারিত থাকলে অনেক কামেল অলী দরবেশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন- আজমীর শরীফ, বাগদাদ শরীফ ও সিলেটে হয়ে থাকে।

পঞ্চমতঃ হজ্জ ও জিয়ারত উভয়টির জন্যই আল্লাহ ও রাসূল সময় নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এখানে ও উল্লিখিত গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিহীত। প্রতিপক্ষগণ এ ব্যাপারে কি বলবেন?

উরস বিরোধীদের কতিপয় আপত্তি ও তার জবাব

১নং আপত্তিঃ উরস বিরোধী ওহাবীগণ বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অপকৌশল ও কুটতর্ক সৃষ্টি করে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করে থাকে। তাদের একটি আপত্তি হলো--- যাদেরকে তোমরা অলী মনে করো এবং তাঁদের উরস পালন করে থাকো; প্রকৃত পক্ষে তাঁরা অলী কিনা এবং তাঁদের মৃত্যু ঈমানের উপর হয়েছে কিনা— একথার গ্যারান্টি ও প্রমাণ কি? কেননা, জীবনে ভাল থেকেও অনেক লোক কাফির হয়ে মৃত্যু বরণ করতে পারে।

১নং আপত্তির জবাবঃ ওহাবীদের আপত্তি যদি সত্য বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে সাধারণ মুসলমানদের বেলায়ও তো এই আশংকা বিদ্যমান যে, সে ঈমানের সাথে মৃত্যু বরণ করেছে কিনা? তা হলে তার গোসল, জানাজা, সম্পত্তিবন্টন কোনটাই করা উচিৎ নয়। কেননা আমরা তো নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি না যে, সে ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরন করেছে কিনা? প্রকৃত ব্যপার হচ্ছে— শরীয়ত সব সময় প্রকাশ্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে এবং এটার উপরই আমল করতে হয়। শুধু সন্দেহও সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে শরীয়ত কোন ফয়সালা প্রদান করে না। সাধারণ মুসলমানগণ সতঃস্ফুর্তভাবে যাকে জীবিত কালে অলী বলে স্বীকৃতি প্রদান করে, তিনি শরীয়ত মতে মৃত্যুর পরও অলী। কেননা মুসলমানগণ আল্লাহর স্বপক্ষের স্বাক্ষীর মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদের সুরা বাকারার ১৪৩ নম্বর আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ "তোমরা উত্তম জাতি হিসাবে আমা কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছো এবং তোমরা অন্য জাতির জন্য খোদায়ী স্বাক্ষী হবে পরকালে।" সুতরাং খোদায়ী

সাক্ষীগণ যাকে অলী বলে সাক্ষ্য দেবে, তিনিই আল্লাহর নিকট অলী। নবী করিম (দঃ)-এর যুগে চাক্ষস দু'টি ঘটনাও আল্লাহর বাণীর সত্যতা প্রমাণ করছে। ঘটনা দু'টি ছিল নিম্নরূপঃ একজন লোকের জানাজা নবী করিম (দঃ)-এর সামনে দিয়ে অতিক্রম কালে উপস্থিত সাহাবীগণ ঐ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করলেন। নবী করিম (দঃ) বললেন "ওয়াজাবাত" অর্থাৎ নির্ধারিত হয়ে গেলো। অপর একটি জানাজা অতিক্রম কালে সাহাবীগণ ঐ মৃত ব্যক্তির কিছু দোষত্রুটির উল্লেখ করলেন। নবী করিম (দঃ) এবারও বললেন, "ওয়াজাবাত" অর্থাৎ নির্ধারিত হয়ে গেলো। সাহাবী গণ এ কথার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে আরজ করলেন— ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ),আমরা যখন একজনের প্রশংসা করলাম, তখন আপনি বললেন "ওয়াজাবাত" অর্থাৎ সাব্যস্থ হয়ে গেলো। আবার অন্য একজন মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে যখন আমরা কিছু দুর্নাম করলাম, তখনও আপনি বললেন- "ওয়াজাবাত" অর্থাৎ সাব্যস্থ হয়ে গেলো। কি সাব্যস্থ হলো - তা তো আমরা বুঝলাম না। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন - "যখন তোমরা একজনকে ভাল বলেছো, তখন তার জন্য জান্নাত সাব্যস্থ হয়ে গেছে। আর অন্যজনকে খারাপ বলেছো। তার জন্য ও জাহান্নাম সাব্যস্থ হয়ে গেছে। কেননা اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ "তোমরা এই জমীনের বুকে খোদায়ী সাক্ষী।" (মিশকাত জানাজা অধ্যায়- বুখারী ও মুসলিম)। সুতরাং সর্বসাধারণ যাকে অলী বলে সাক্ষ্য দেবে, সে নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেও অলী। মুসলমানদের সর্ব সম্মত মতামত শরীয়তের একটি বড় দলীল। এটাকে আরবী পরিভাষায় "ইজ্‌মায়ে উম্মত" বলা হয়। মুসলমানগণ উরস, ফাতিহা, মিলাদ খতমে গাউছিয়া, খতমে খাজেগান, খতমে বুখারী, ওয়াজ ও জিকিরের মাহফিল, ইত্যাদিকে উত্তম বলে সর্বসম্মত ভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। সুতরাং এটা দলীল হয়ে গেছে। পরবর্তী যুগে ইবনে তাইমিয়া ও তার ভাবশিষ্য মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী ঐ নেককাজ গুলোকে অস্বীকার করে নানা কুটতর্ক জুড়ে দিয়েছে। বর্তমানে ঐ দুজনের অনুসারী খারিজী বা ওহাবী সম্প্রদায়ের লোকেরাও আপত্তি করে থাকে। এতে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত ইজ্‌মার ক্ষেত্রে কোন ব্যাঘাত ঘটবেনা। এটাই অছুলের নীতি।

শুধু সম্ভাবনার উপর নির্ভর করতে গেলে বিরুদ্ধ বাদীদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হয়ঃ মৃত্যু কালীন সময়ের অনিশ্চয়তা তো একজন কাফিরের বেলায়ও

হতে পারে। এমনও তো হতে পারে যে, ঐ কাফির মৃত্যুর সময় ভিতরে ভিতরে মুসলমান হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। তা হলে তো কোন বিজাতিকেও কাফির বলা যাবেনা। কোন কাদিয়ানীকেও কাফির বলা যাবে না। কেননা মৃত্যুর সময় তার ঈমান গ্রহণের সম্ভাবনা ও থাকতে পারে। অথচ ওহাবীরা খতমে নবুয়তের নাম নিয়ে কাদিয়ানীদেরকে মৃত্যুর পূর্বেও কাফের বলে ফতোয়া দিয়ে রেখেছে। এটা কি তাদের স্বধিরোধিতা নয়? সুতরাং খোদায়ী সাক্ষী মুসলমানগণ স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে যাকে অলী বলে সাক্ষ্য দেয়, তিনি আল্লাহর নিকটও অলী। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছেঃ

مَارَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ۔

অর্থাৎ "যে কাজকে মুসলমানগণ স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে ভাল বলে, তা আল্লাহর নিকটও উত্তম।" এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর একক বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় আপত্তিঃ উরসের রিরুদ্ধে ওহাবীদের দ্বিতীয় আপত্তি হলো— উরসের সময় দরগাহ্‌ বা মাজারে অত্যধিক লোকের ভীড় লেগে যায় এবং মেলার রূপ পরিগ্রহ করে। নবী করিম (দঃ) কবরস্থানে মেলার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন এক হাদীসে এসেছেঃ لَا تَتَّخِذُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا۔

অর্থাৎঃ "আমার রওজা মোবারককে ঈদ বানাইওনা।" ঈদের সময় যেমন লোকের সমাগম হয় এবং আনন্দ খুশী করা হয়। কবরের নিকট এরূপ করতে নবী করিম (দঃ) নিষেধ করেছেন।

জবাবঃ বিরুদ্ধবাদীরা হাদীসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছে ঃ এটাকে সত্য বলে ধরে নিলে অর্থ দাঁড়ায় – নবী করিম (দঃ)-এর রওজা মোবারকে ঈদের দিনের মত অনেক লোকের সমাগম হতে পারবেনা। অথচ বর্তমানে মদিনা শরীফে রওজা মোবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে দিনরাত লক্ষ লক্ষ লোক হাজির হচ্ছেন। তাদের মতে এটাও হাদীসের মর্মানুযায়ী নিষিদ্ধ। (নাউজু বিল্লাহ)

উল্লেখিত হাদীস শরীফের দুটি সঠিক ব্যাখ্যা মোহাদ্দেসীন কেরাম উল্লেখ করেছেন। ১ম ব্যাখ্যাটি আল্লামা মানাভী (রহঃ) তাইছির গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন "এ হাদীসে নবী করিম (দঃ) উম্মতকে লক্ষ্য করে তাঁর রওজা মোবারক ঘন ঘন জিয়ারত করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। বৎসরে মাত্র দুইটি ঈদের দিন ব্যতিত অন্যান্য দিনের মত রওজা মোবারককে জন মানব শুন্য যেন বানানো না হয় এবং জিয়ারত বৎসরে মাত্র দুবার যেন করা না হয়।"(তাইছির)

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হচ্ছে— "তোমরা আমার রওজা মোবারককে আনন্দ ফুর্তি বা খেলাধূলার স্থানে পরিণত করোনা। বরং আদব ও সম্মানের স্থানে পরিণত করো। ইহাই সঠিক ব্যাখ্যা। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী ফয়সালা হাফ্‌ত মাসআলা উরস অধ্যায়ে এ ব্যাখ্যাটিই গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং উপরে উল্লেখিত হাদীস খানা বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্য পূরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বরং নবী ও অলীগণের মাজারে একত্রিত হয়ে আদব রক্ষা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে উক্ত হাদীসে এবং "তোমরা" এই বহু বচন ব্যবহার করে অনেক লোকের সমাবেশকে বরং উৎসাহিতই করা হয়েছে।

তৃতীয় আপত্তিঃ উরস শরীফের বিরুদ্ধে ওহাবী পন্থীদের তৃতীয় আপত্তি হচ্ছেঃ উরস উপলক্ষে পুরুষ ও মেয়েলোকের একত্রে মেলামেশা হয়। নাচ-গান হয়। কাউয়ালী ও গানবাদ্য হয়। এমনকি গাজাখুরী পর্যন্ত চলে। এগুলো শরীয়তে সরাসরি হারাম। সুতরাং উরসও হারাম।

জবাবঃ উল্লেখিত আপত্তির দুটি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে উরস শরীফ। দ্বিতীয় অংশটি হচ্ছে- গানবাদ্য, নারী পুরুষের সংমিশ্রণ, গাজাখুরী ও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ। উরস বিরোধীরা উভয়টিকে হারাম বলেছেন। এটা অন্যায় ও জুলুম। প্রথমটি উরস - যা তাদের গুরু জনদের মতেও বৈধ। আহলে সুন্নাতের ওলামায়ে কেরামদের মতে তো উরস জায়েজ এবং উত্তম কাজ যা হযরত আমির হাম্‌যা (রাঃ)-এর জন্য মদিনা শরীফের উলামাগণ পালন করতেন। দ্বিতীয় প্রকারের কাজ গুলো কোন কোনটি শরীয়ত মোতাবেক নাজায়েজ।

উরস হলো মূল কাজ –যা শরীয়তে বৈধ। বিদয়াতী ও শরীয়ত বিরোধী কাজগুলো হলো উপসর্গ। এটা সুস্থ দেহে রোগের উপসর্গ স্বরূপ। সুস্থ শরীরে রোগের উপসর্গ দেখা দিলে রোগ দূর করতে হবে। শরীর ঠিক রাখতে হবে। যেমন বিবাহ অনুষ্ঠানে শরীয়ত বিরোধী কাজ হলে বিবাহ পড়ানো না জায়েজ বা অশুদ্ধ হবে না। কেননা বিবাহ হচ্ছে ইজাব কবুলের নাম। গান বাদ্য, নাচগান- ইত্যাদি শরীয়ত বিরোধী উপসর্গ। এগুলো দূর করা সম্ভব। চিনিতে পিপিলীকা পতিত হলে চিনি হারাম বা মাকরূহ হয়না। পিপিলীকা মাকরূহ এবং তা দূর করা সম্ভব। তাই চিনি খেতে হবে এবং পিপিলীকা দূর করতে হবে। মশা কামড় দেয় বলে মশারীতে আগুন দেয়া নির্বোধেরই কাজ। মশা মারতে হবে। কিন্তু মশারী ঠিক রাখতে হবে। অনুরূপ ভাবে মূল উরস শরীফ ঠিক রেখে শরীয়ত বিরোধী উপসর্গ গুলো দূর করতে হবে। জগদ্বিখ্যাত ফাত্‌ওয়ার কিতাব ফতোয়ায়ে শামী "জিয়ারতে কবর" অধ্যায়ে এই ফতোয়াটিই এভাবে উল্লেখ করেছেন—

وَلَا تُتْرَكُ لِمَا يَحْصُلُ عِنْدَهَا مِنْ مُنْكَرَاتٍ وَمَفَاسِدَ كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَغَيْرِهَا لِأَنَّ الْقُرُبَاتِ لَا تُتْرَكُ لِمِثْلِ ذٰلِكَ بَلْ عَلَى الْإِنْسَانِ فِعْلُهَا وَإِنْكَارُ الْبِدَعِ - قُلْتُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ تَرْكِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ نَائِحَاتٌ -

অর্থাৎ "কবর বা মাজার জিয়ারত একারণে পরিত্যাগ করা যাবেনা যে, সেখানে অন্যান্য না জায়েজ ও ফিতনা ফাসাদের কাজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যেমন নারী পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা ইত্যাদি। কেননা কোন নেক কাজ ঐ বদ উপসর্গের কারণে পরিত্যাগ করা যাবে না। বরং লোকদের উচিৎ - মাজার জিয়ারত করা এবং বিদয়াত প্রতিরোধ করা। আমি (ইবনে আবেদীন) বলবো - এই মস্‌আলা ও ফয়সালার স্বপক্ষে পূর্বে উল্লেখিত একটি সিদ্ধান্তও খুবই সহায়ক হবে। তা হলোঃ যদি কোন জানাজার সাথে ক্রন্দন কারিনী ভাড়াটিয়া মহিলা গমন করে, তা স্বত্বেও উক্ত জানাজায় গমন করা থেকে বিরত থাকা যাবে না। (কেননা জানাজার সাথে গমন করা সুন্নাত)

আল্লামা শামী (রহঃ) একজন বিজ্ঞ জজের ন্যায় চুলচেরা বিশ্লেষণ করে মূল জিয়ারতকে বৈধ বলেছেন এবং সংশ্লিষ্ট উপসর্গ গুলো দূর করার উপর জোর দিয়েছেন। এটাই ইনসাফ। আরও অনেক উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। যেমন ঃ মক্কা বিজয়ের পূর্বে নবী করিম (দঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম ওমরহ্‌া পালন উপলক্ষে খোদার ঘর তাওয়াফ করেছিলেন এবং সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যখানে সায়ীও করেছিলেন। অথচ ঐ সময় খোদার ঘরের ভিতরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতে আসেফ ও নায়েলা নামক, দুটি পাথরের মূর্তি বিদ্যমান ছিল। তাই বলে কি নবী করিম (দঃ) তাওয়াফ বন্ধ করেছিলেন বা তাওয়াফকে হারাম বলেছিলেন? না, বলেন নি; বরং তাওয়াফ করেছিলেন। যখন সুযোগ এসে গেলো এবং মক্কা বিজয় হলো, তখন তিনি নিজ হাতে তা দুর করে দিয়েছিলেন।

মার্কেটিং এ-প্রত্যেক আলিম উলামা গমন করে থাকেন। যেখানে নারী পুরুষের ভিড় হয়, সংমিশ্রন হয়। রেল, বাস ইত্যাদি যান বাহনে নারী পুরুষ একত্রে ভ্রমন করে এবং খোদার ঘরে নারী পুরুষ একত্রে তাওয়াফ করে। কোন জ্ঞানী বা সুবিবেচক ব্যক্তি কি বলতে পারেন যে, নারীদের উপস্থিতির কারণে মার্কেটিং, যানবাহনে ভ্রমন এবং তাওয়াফ হারাম হয়ে যাবে? ঠিক অনুরূপভাবে উরস বা মাজার জিয়ারতে আজকাল ইসলামী শাসন না থাকার কারনে নারীদেরও আগমন ঘটে থাকে এবং অন্যান্য শরীয়ত বিগর্হিত কাজও হতে দেখা যায়। তাই বলে উরস শরীফ ও মাজার জিয়ারত– যা সুন্নাত– তা হরাম হতে পরে না।

মাজার ও উরসে নারীদের উপস্থিতি এবং পুরুষদের সাথে সংমিশ্রণের অজুহাত দেখিয়ে উরস ও জিয়ারত হারাম হওয়ার পক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশকারীগণকে, তাবুক যুদ্ধে জনৈক মুনাফিকের ওজর আপত্তি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। নবী করিম (দঃ) দূরতম দেশে অর্থাৎ তাবুকে যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য আহবান জানানোর পর, জনৈক মুনাফিক (ইবনে কায়েসের দাদা) ওজর ও অপরাগতা পেশ করে বললো ঃ রোম ও শামের মেয়েরা খুবই সুন্দরী। আমি নারী পাগল। সেখানে গেলে আমার চরিত্র ঠিক থাকবেনা। বরং ফিৎনায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তাই আমাকে ক্ষমা করুন। আমিএই সম্ভাব্য ফিৎনায় যাব না। উক্ত মুনাফিকের আপত্তির জবাবে আল্লাহ তাঁয়ালা সুরা তৌবার ৪৯ নং আয়াতে এরশাদ করেন—

الا فى الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين۔

অর্থাৎ– হাঁ! তারা (মুনাফিক) ফিৎনার (মুনাফিকির) মধ্যেই পতিত হয়ে গেছে। আর তাদের মত কাফিরদেরকে বেষ্টন করে রয়েছে জাহান্নাম। (তাফসীর কবীর ও রুহুল বয়ান)

অনুরূপ ভাবে উরস শরীফ বিরোধীরাও বিভিন্ন বাহানা করে উরস শরীফকে বন্ধ করেতে চায়। এটা তাদের অলী দুশমনীর প্রমাণ এবং নজদী প্রেমের নিদর্শন। তারা ফিৎনার মধ্যে পতিত। ফিৎনার চোরা বালিতে মুখ লুকানোই তাদের স্বভাব।

উরস শরীফে মারফতী গান বা কাওয়ালী সম্পর্কে ওলামাগনের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী মাজহাবের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে বাদ্যযন্ত্র ছাড়া গান বা গজল জায়েজ। কিন্তু বাদ্যযন্ত্র সহকারে নাজায়েজ।

আবার কোন কোন আলিম জায়েজ বলেছেন। আরবীতে এটাকে ছামা বলে। ইমাম গাজজালী(রহঃ) ছয়টি শর্ত সাপেক্ষে ছামা জায়েজ বলে উল্লেখ করেছেন। শর্ত ৬টি হলো– (১) গায়ক নামাজী ও হালের অধিকারী হওয়া (২) শ্রোতা নামাজী ও হালের অধিকারী হওয়া (৩) কোন মেয়েলোক উক্ত জলছায় না থাকা (৪) নূতন গোঁফ গজানো বালক তথায় না থাকা (৫) কোন মেয়েলোক দ্বারা ছামা' না গাওয়ানো (৬) পুরুষ দ্বারা ছামা' গাওয়ানো।

মোট কথা ছামা শুনার উপযুক্ত ব্যক্তির জন্যই ছামা' জায়েজ। অন্যের জন্য নয়। মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবী সাহেবের পীর-হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী সাহেব ফয়সালা হাফত মাসআলা পুস্তিকায় ছামা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ঃ

محققین کا قول یہ ہے کہ اگر شرائط جواز جمع ہوں اور عوارض مانع مرتفع ہو جائیں تو جائز ہے ورنہ ناجائز۔

অর্থাৎ- ছামা সম্পর্কে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মত হলো-যদি জায়েজ হওয়ার শর্ত সমূহ(৬টি) পাওয়া যায় এবং নিষেধাজ্ঞাসূচক কোন উপসর্গ বা কারণ সমূহ বিদ্যমান না থাকে, তা হলে ছামা জায়েজ। নতুবা না জায়েজ।

তদুপরি হযরত কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহঃ), হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া মাহবুবে ইলাহী (রহঃ) ও হযরত আমীর খসরু (রহঃ)-এর মত জগৎবিখ্যাত অলীগণও ছামা করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী তরিকরেত শীর্ষস্থানীয় লোকদের জন্য ছামা উপকারী বলে মকতুবাত শরীফে মন্তব্য করেছেন।

সুতরাং উরসে, মারফতী গান-বাদ্যের ওজর আপত্তি তোলা; উরস শরীফ না জায়েজ হওয়ার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই হতে পারেনা। অধম লেখক, বাদ্যযন্ত্রের বিপক্ষে মত পোষনকারীদের অন্তর্ভূক্ত। তবে অলী-আল্লাহ গণের কার্যকলাপের সমালোচনা কারীও নহি।

৪ নং আপত্তি ঃ উরস শরীফ বিরোধীদের একটি শক্তিশালী যুক্তি হচ্ছে ঃ ফোকাহায়ে কেরামগন বলেছেন— যে জেয়াফতে নাচ গান করা হয়, সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। দাওয়াত কবুল করা সুন্নাত। কিন্তু হারাম কাজ সংযুক্ত হওয়ার কারণে দাওয়াতে যাওয়া হারাম হয়ে গেল। উরসের ব্যাপারটির অনুরূপ। এক মন দুধে এক ফোটা গো-চনা পড়লে সমস্ত দুধ-ই হারাম হয়ে যায়। অনুরূপ ভাবে উরসের মধ্যে হারাম কাজ হলে উরসও নাজায়েজ হবে। এটি হলো তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দলীল।

জবাব ঃ হালালের মধ্যে যদি হারামকাজ উপসর্গ হিসাবে অনুপ্রবেশ করে তাহলে ফতোয়া এক রকম হবে। আর হারাম কাজটি যদি হালাল কাজের অঙ্গীভূত ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে পরিণত হয়, তা হলে ফতোয়া অন্য রকম হবে। হারাম কাজ যদি হালাল কাজের এমন অবিচ্ছেদ্য অংশ হয় যে, উহা পৃথক করা যায় না বা করলে ঐ হালাল কাজটি সম্পন্ন করা যায় না, তাহলে এই সুরতে উহা হারাম হবে। যেমন উপরের উল্লেখিত জেয়াফতে নাচগান যদি জেয়াফতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়-যা ছাড়া উক্ত জেয়াফত হতে পারে না, তাহলে হারাম হবে। দুধের সাথে গো-চনা এমনভাবে মিশে যায়, যা পৃথক করা যায় না। তাই সব দুধই হারাম হবে। কিন্তু জেয়াফত সেরূপ নয়।

আর হারাম বস্তুটি বা কাজটি যদি হালাল কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ না হয়; বরং বাহ্যিকভাবে যোগ হয় এবং ইচ্ছা করলে পৃথক করা যায় বা বাদ দেয়া যায়, তাহলে মূল কাজটি বা বস্তটি হালাল হবে। যেমন— শক্ত ঘিতে ইঁদুর পড়ে মারা গেলে যতটুকু ঘিতে মরা ইঁদুরের রস মিশেছে, ততটুকু ঘি ফেলে দিলে, বাকীটুকু হালাল হবে। অনুরূপ ভাবে উরস শরীফে নাচগান ও অন্যান্য শরীয়ত গর্হিত কাজ উরসের অংশ নহে। তাই এ কারণে মুল উরস হারাম হবে না। ফোকাহাগনের ফতোয়ার ইহাই মুল তাৎপর্য্য। উরস শরীফের মধ্যে গান বাজনা বা মেয়েলোকদের যাতায়াত উরসের অবিচ্ছেদ্য অংশ নহে। যেমন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) -এর উরস শরীফ, মোজাদ্দেদ আলফে সানী (রহঃ) -এর উরস শরীফ এবং অন্যান্য অনেক মাজারের উরস শরীফে গানবাদ্য নেই এবং মহিলাদেরও যাতায়াত নেই। কাজেই সব উরসকে ঢালাও ভাবে হারাম বলা অবান্তর। ফোকাহাগণ বলেছেনঃ যে জেয়াফতে দস্তরখানে নাচ গান পরিবেশন করা হয়, সে জেয়াফতের দাওয়াত কবুল করা সুন্নাত ও জায়েজ নহে। অন্য স্থানে নাচ গান হলে জেয়াফতে যোগ দিতে নিষেধ নেই। অনুরূপ ভাবে যে উরসে অন্য জায়গায় নাচ গান হয়, কিন্তু মূল মাজারে উরসের কার্যাদি শরীয়ত মোতাবেক সম্পন্ন হয়, সেখানে যোগদান করা বৈধ।

মাজার জিয়ারত মূলতঃ সুন্নাত। কাজেই নারী পুরুষ একত্রিত হলে মুল সুন্নাত হারাম হবে না। জেয়াফতের দাওয়াত কবুল করা তখনই সুন্নত, যখন হারাম কাজ থেকে খালী হবে। সুতরাং ফোকাহায়ে কেরামের জেয়াফত সংক্রান্ত দাওয়াত গ্রহণ ও উপস্থিতি শর্তসাপেক্ষ। কিন্তু জিয়ারত হচ্ছে নিঃশর্ত। এই সুক্ষ্ম পার্থক্যটি না বুঝার কারণেই বিরোধী মহলে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। সত্যকে গ্রহণ করাই সমিচীন। আল্লাহ আমাদের সত্য উপলব্ধির তৌফিক দিন। আমিন॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ ও সুন্নাত

কবর বা মাজার বলতে আমরা বুঝি মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মৃত দেহের অবস্থান স্থলকে আরবীভাষায় কবর (قَبْرٌ) বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায়, মুসলমানদের উক্ত অবস্থান স্থলকে সাধারণভাবে আরবী ভাষায় "কবর" বলা হায়। আল্লাহর অলি ও বুজুর্গগণের কবরকে, ফার্সী ভাষায় "মাজার" বা দরগাহ বলা হয়। আর নবী ও রাসূলগণের কবরকে "রওজা" বা "বেহেশ্‌তের বাগান" বলা হয়।

আউলিয়ায়ে কেরামের মাজার শরীফ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা শরীয়ত মতে জায়েজ এবং সওয়াবের কাজ। ইবনে তাইমিয়া-ই (৭০৫হিঃ) সর্ব প্রথম মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে হারাম এবং শির্‌ক বলে জোরের সাথে ঘোষণা করেছে। এরপূর্বে ইবনে হাজম ব্যতিত আর কেউ এমন কথা বলেনি। ইবনে তাইমিয়া নবী করিম (দঃ)-এর রওজা মোবারকের জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করাকেও শিরক বলে অভিহিত করেছে। সে ছিল খারিজী সম্প্রদায়ভুক্ত। যুল খোয়াইছরা নামক জনৈক মুনাফিকের বংশে তার জন্ম। তার অনুসারী নজদের মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী ও ভারতের ইসমাইল দেহলভী এবং তাদের অনুসারীগণ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে হারাম বলে মনে করে। এরা ভ্রান্ত ও গোমরাহ। (জাওয়াহিরুল বিহার, ওহাবী মাজহাব ইত্যাদি)

সফরের উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ মোতাবেক সফরের হুকুম হয়ে থাকে। অর্থাৎ– (ক) উপলক্ষ যদি ফরজ হয়, তবে এরজন্য সফর করাও ফরজ। যেমন—হজ্জ। এর জন্য সফর করাও ফরজ।

(খ) উপলক্ষ যদি ওয়াজিব হয়, তাহলে এর জন্য সফর করা ও ওয়াজিব।

যেমন—মান্নতি হজ্জ ওয়াজিব। সুতরাং এর জন্য সফর করাও ওয়াজিব।

(গ) উপলক্ষ যদি সুন্নাত হয়, তাহলে তারজন্য সফর করাও সুন্নাত। যেমন—জিয়ারত সুন্নাত কাজ। সুতরাং এর জন্য সফর করা ও সুন্নাত

(ঘ) মোবাহ্ বা জায়েজ কাজের জন্য সফর করাও মোবাহ এবং জায়েজ।

যেমন—ব্যবসা বাণিজ্য ও বন্ধু বান্ধবের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর করা।

(ঙ) উপলক্ষ যদি হারাম ও নাজায়েজ হয়, তাহলে এর জন্য সফর করাও হারাম ও নাজায়েজ হয়। যেমন—চুরি করার জন্য সফর করাও হারাম।

উপরোক্ত নীতি মালা অনুযায়ী উরস শরীফের জন্য সফর করা সুন্নাত। কেননা, উরস শরীফে যোগদান করা জিয়ারতের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআন মজিদে বিভিন্ন সফরের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন—

(ক) হিজরতের সফর (খ) ব্যবসা সংক্রান্ত সফর

(গ) পীর ও মাশায়েখের সাথে মোলাকাতের উদ্দেশ্যে সফর যেমনঃ খিজির (আঃ)-এর অনুসন্ধানে হযরত মুছা (আঃ)-এর সফর।

(ঘ) প্রিয়জনের অনুসন্ধানে সফর। যেমন— ইউসুফ (আঃ)-এর অনুসন্ধানে তাঁর পিতা কর্তৃক ছেলেদের সফর প্রেরণ।

(ঙ) চিকিৎসার জন্য সফর। যেমন—ইউসুফ (আঃ)-এর জামা নিয়ে মিশর থেকে অন্যান্য ভাইদের কেনানে সফর।

(চ) রুজী-রোজগারের জন্য সফর। যেমন—খাদ্য সংগ্রহের জন্য ইয়াকুব (আঃ) কর্তৃক ছেলেদের মিশর সফর প্রেরণ।

(ছ) কাফেরদের নিকট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সফর। যেমন—ফেরআউনের নিকট হযরত মুছা (আঃ)-এর সফর।

(জ) এলেম তলব করার উদ্দেশ্যে সফর। যেমন—বিদ্যা শিক্ষার জন্য চীনদেশের বা দুরদেশের সফর।

(ঝ) হেদায়াত গ্রহণের লক্ষ্যে গজব প্রাপ্ত এলাকার সফর। যেমন—

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ .

"কুল ছিরো ফিল আরদে কানজুরু কাইফা কানা আকিবাতুল মুকাজ্জিবীন।"—তোমরা পৃথিবীময় ভ্রমন করে দেখো মিথ্যাবাদী কাফেরদের পরিনাম কি হয়েছিল।

স্বয়ং কুরআন মজিদেই উপরোক্ত সফর গুলোর কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং আউলিয়ায়ে কেরামের মাজার জিয়ারতের জন্য সফর করা উত্তমরূপেই প্রমাণিত হলো। কেননা, অলী-আল্লাহগণ রূহানী ডাক্তার। তাদের মাজারের তাছির ভিন্ন ভিন্ন। ফয়েজও ভিন্ন ভিন্ন। তাঁদের মাজারে দোয়া কবুল হয়। ইবাদতের আগ্রহ জাগ্রত হয়।

মাজার জিয়ারতের ১নং দলীলঃ

দুনিয়ার সমস্ত মাজারের মধ্যে উত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মাজার হচ্ছে নবী করিম (দঃ)-এর রওজা মোবারক। রওজা মোবারকের জিয়ারত ও জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা ওয়াজিব। একাজের বিনিময়ে হুজুর (দঃ)-এর শাফায়াত অবধারিত। ইমাম তকিউদ্দিন সুবুকী (৭২৭ হিজরী) তার লিখিত 'শিফাউস সিকাম' গ্রন্থে সহি সনদে হাদীস শরীফ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ শুধু রওজা মোবারকের উদ্দেশ্যেই সফর করা ও জিয়ারত করা উত্তম ইবাদত এবং নৈকট্য লাভের উত্তম পন্থা । যেমন নবী করিম (দঃ)-এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا يَعْمِلُهُ حَاجَةٌ الَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ اَنْ اَكُوْنَ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْكَبِيْرِ وَالدَّارُ قُطْنِيُّ فِي اَمَالِيْهِ)

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কেবল আমার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আমার রওজা মোবারকে আসবে এবং এই আগমনের মধ্যে কেবল আমার জিয়ারতই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করবে, তাহলে পরকালে তার জন্য সাফায়াতকারী হওয়া আমার নৈতিক দায়িত্ব হয়ে পড়বে" (তিববানীর মো'জামে কবীর এবং দারে কুত্‌নীর আমালি গ্রন্থ)।

তিনি আরও এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي (رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ)

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আমার রওজা মোবারক জিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) হয়ে যাবে।" (দারে কুত্‌নী ও ইমাম বায়হাকী)।

উপরে উল্লেখিত দুখানা হাদীসে দুনিয়ার যে কোন স্থানের, যে কোন মুসলমানের মদিনা শরীফে আগমন ও রওজা মোবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার বৈধতা উক্ত হাদীস দুখানা দ্বারাই প্রমাণিত। "মান" (مَنْ)শব্দটি ব্যাখ্যা, তা সকলের জন্য প্রযোজ্য। যে কোন দূরত্বের লোকই এই হাদীসের অন্তর্ভূক্ত।

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে ঃ জিয়ারত করা হলো রোকন এবং সফর করা হলো তাঁর পূর্বশর্ত। শর্ত পূরন হলেই কাজ করা সম্ভব। যেমন ঃ হজ্ব করা ফরজ। কিন্তু এই ফরজ আদায়ের জন্য সফর করা পূর্বশর্ত। শর্ত ব্যতিত উদ্দেশ্য পূরন হতে পারে না। এটাই উসুলে ফেকাহ্‌র নীতিমালা। যেমন

اِذَا ثَبَتَ الشَّئُ ثَبَتَ بِلَوَازِمِهٖ

অর্থাৎ "কোন বস্তু বা কাজ বাস্তবায়নের জন্য তার যাবতীয় উপায় উপাদান বা পূর্বশর্ত বাস্তবায়ন করতে হয়।"

তৃতীয় বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে—প্রথম হাদীসে উল্লেখিত "জাআ" (جَاءَ) শব্দটি। অর্থাৎ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগমন করা। নবী করিম (দঃ) উম্মতকে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগমন করার অনুমতি দিয়েছেন "জাআ" (جَاءَ)শব্দটির মাধ্যমে। অথচ ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর অনুসারী ওহাবী সম্প্রদায় উক্ত সফর বা ভ্রমণকে শিরক বলে অভিহিত করে মুসলমানকে মুশরিকে পরিণত করেছে। নাউজুবিল্লাহ! তাদের ধোকাও প্রতারনা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাই।

সুন্নী ওলামা গণের প্রতি উপরের ব্যাখ্যাটি ভাল করে স্মরনে রাখার অনুরোধ রইলো। আল্লাহ আমাদের সঠিক উপলব্ধি দান করুন।

২নং দলীলঃ মেশকাত শরীফ 'জিয়ারত' অধ্যায়ে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ اَلَا فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

অর্থাৎ "আমি (নবী দঃ) তোমাদেরকে প্রাথমিক যুগে কবর জিয়ারত থেকে নিষেধ করতাম। এখন তোমরা কবর জিয়ারত করো। কেননা, জিয়ারতের দ্বারা পরকালের কথা স্মরণে আসে।" (বায়হাকী)

উক্ত হাদীসে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়। যথা –

১। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাময়িক ভাবে কবর জিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। কারণ, মুসলমানগণ সদ্য শিরক ত্যাগ করে কেবলমাত্র মুসলমান হয়েছেন। তদুপরি মুসলমানদের জন্য পৃথক কোন কবরস্থান তখনও ছিলনা। মুশরিক- ইয়াহুদী-খৃষ্টান ও মুসলমানগণকে একই কবরস্থানে দাফন করা

হতো। মুসলমানের কবর জিয়ারত করতে গেলে মুশরিকদের কবর বা শ্মশানও জিয়ারত হয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা ছিল। তাই শিরকের ধারণা ও সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য নবী করিম (দঃ) সাময়ীক ভাবে প্রথম দিকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করতেন। পরে কারণ দূর হয়ে যাওয়ায় অনুমতি প্রদান করেন।

২। দ্বিতীয় বিষয় প্রমাণিত হলো যে, অত্র হাদীসের ঘোষণার দ্বারা নবী করিম (দঃ) পূর্ব নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন এবং কবর জিয়ারতকে জায়েজ বা বৈধ ঘোষণা করেছেন।

৩। "ফাজুরুহা" (فَزُوْرُوْهَا) শব্দ দ্বারা কবর জিয়ারতের আদেশ করেছেন। সুতরাং জিয়ারত সুন্নাত প্রমাণিত হলো।

৪। "ফাজুরুহা" শব্দ দ্বারা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সফলকে সাধারণভাবে জিয়ারতের অনুমতিও আদেশ দিয়েছেন।

৫। উক্ত হাদীসে পৃথিবীর যে কোন স্থানের কবর জিয়ারতের অনুমতিও দিয়েছেন। সুতরাং জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার অনুমতিও দিয়েছেন। কেননা, সফর করার অনুমতি না দিয়ে শুধু জিয়ারতের অনুমতি প্রদান করা সম্ভবপর নয়। ইহা অবাস্তব। আল্লাহর রাসূল অবাস্তব কোন নির্দেশ দিতে পারেন না। যদি বলা হয়, খাজা গরীব নাওয়াজের মাজার জিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হলো, কিন্তু সফর করার অনুমতি দেয়া হলো না, তাহলে এই অনুমতি যে কোন বিবেকবান লোকের কাছেই অর্থহীন বলে গণ্য হবে। নবীকরিম (দঃ) দূরত্বের কোন শর্ত ছাড়াই যে কোন স্থানের মাজার ও কবর জিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন এই হাদীস দ্বারা। আমার কোন আত্মীয়ের বিদেশে দাফন হলে তার জিয়ারত করতে যেতে পারবো না— এটা যুক্তি ভিত্তিক কথা হতে পারে না। সুতরাং ইবনে তাইমিয়া ও তার অনুসারী ওহাবীরা মারাত্মক ভ্রমে রয়েছে।

৩ নং দলীলঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর ভাই এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ছেলে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) মক্কা শরীফে ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) মদিনা শরীফ থেকে প্রতি বৎসর ভাইয়ের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ-সফর করতেন এবং জিয়ারত কার্য

সমাধা করতেন। আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) ৫৮ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় পর্যন্ত তাঁর এই আমল ছিল। সুতরাং দূরদেশে গিয়ে জিয়ারত করা বা জিয়ারতের নিয়তে দূরদেশে যাওয়া উম্মুল মোমেনীন-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত। ইবনে তাইমিয়া জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে শিরক বলে প্রকারান্তরে উম্মুল মুমিনীনকে মুশরিক বলে সাব্যস্থ করেছে।

(আল বাছায়েরও গাউসুল ইবাদ)

৪নং দলীলঃ নবী করিম (দঃ)-এর ইনতিকালের পর হযরত বেলাল (রাঃ) শোকে মদিনা ছেড়ে সিরিয়া চলে যান এবং জেহাদে অংশ গ্রহণ করে জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। দীর্ঘদিন পর হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে তিনি একদিন স্বপ্নে নবী করিম (দঃ)-এর দীদার লাভ করেন। নবী করিম (দঃ) স্বপ্নে এরশাদ করলেন مَا هٰذَا الْجَفَاءُ يَا بِلَالُ – "হে বেলাল! এটা কেমন জুলুম?" অর্থাৎ তুমি দীর্ঘদিন ধরে আমার সাথে দেখা করছনা কেন? এ স্বপ্ন দেখে হযরত বেলাল (রাঃ) তৎক্ষনাৎ মদিনার পানে রওনা দিলেন জিয়ারতের উদ্দেশ্যে। যখন তিনি মদিনায় পৌছলেন, তখন এ খবর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়লো। আবাল বৃদ্ধ বনিতার মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। ইমাম হাসান-হোসাইন (রাঃ) দৌড়ে আসলেন। হযরত বেলাল রাঃ) সোজা রওজা পাকে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং রওজা পাকে কপাল ঘষতে লাগলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম হতবাক হয়ে এ দৃশ্য দেখলেন। কিন্তু কেউ নিষেধ করলেন না। فَجَعَلَ يَبْكِيْ وَ يُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلٰى قَبْرِهٖ অর্থাৎ " হযরত বেলাল (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন এবং রওজা পাকে আপন কপাল ঘষতে লাগলেন।" (সিফাউস সিকাম-ইমাম তকিউদ্দিন সুবকী ও আদিল্লাতু আহ্লিছ ছুন্নাত কৃত আল্লামা ইউসুফ রেফায়ী-কুয়েত)। এতেও জিয়ারতের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সফর প্রমাণিত হল।

৫নং দলীলঃ ইমাম শাফিয়ী (রহ) সুদূর ফিলিস্তিন থেকে সফর করে বাগদাদ শরীফ এসে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মাজার শরীফ জিয়ারত করতেন এবং বরকত লাভ করতেন। ফতোয়া শামীর গ্রন্থকার মোকদ্দমা বা ভূমিকা অধ্যায়ে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) -এর মাহাত্ব অনুচ্ছেদে ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) থেকে একটি উধৃতি উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বলেনঃ

اِنِّيْ لَاَتَبَرَّكُ بِاَبِيْ حَنِيْفَةَ وَ اَجِيْئُ اِلٰى قَبْرِهٖ فَاِذَا عَرَضَتْ لِيْ حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَ سَاَلْتُ اللّٰهَ عِنْدَ قَبْرِهٖ فَتُقْضٰى سَرِيْعًا .

অর্থঃ "আমি (ইমাম শাফিয়ী) বরকত লাভের উদ্দেশ্যে ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) মাজারে আগমন করে থাকি। যদি কোন বিষয়ের সমাধান প্রয়োজন হতো, তখন আমি দু'রাকআত নফল নামাজ পড়ে, তাঁর মাজারে গিয়ে খোদার কাছে (তাঁর উছিলা ধরে) প্রার্থনা করতাম। সাথে সাথে আমার সে মকসুদ পূর্ণ হয়ে যেতো"। (ফতোয়া শামীর মোকদ্দমা-ইমাম আবু হানিফার মাহাত্ব অধ্যায়)।

এতে ৪টি বিষয় প্রমানিত হলো। যথা (১) মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর দেশে গমন করা, (২) কবরবাসী অলি-আল্লাহ থেকে বরকত লাভ করা (৩) মাজারে দোয়া করা (৪) কবরবাসী অলি-আল্লাহ কে মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার উছিলা মনে করা।

৬নং দলীলঃ ফতোয়া শামী ১মখন্ড জেয়ারতে কুবুর' অধ্যায়ে উল্লেখ আছেঃ

وَ هَلْ تُنْدَبُ الرِّحْلَةُ لَهَا كَمَا اعْتِيْدَ مِنَ الرِّحْلَةِ اِلٰى زِيَارَةِ خَلِيْلِ الرَّحْمٰنِ وَ زِيَارَةِ السَّيِّدِ الْبَدَوِيِّ لَمْ اَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهٖ مِنْ اَئِمَّتِنَا . وَ مَنَعَ مِنْهُ بَعْضُ الْاَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ قِيَاسًا عَلٰى مَنْعِ الرِّحْلَةِ بِغَيْرِ الْمَسْجِدِ الثَّلٰثِ وَ رَدَّهُ الْغَزَّالِيُّ بِوُضُوْحِ الْفَرْقِ .....

وَاَمَّا الْاَوْلِيَاءُ فَاِنَّهُمْ مُتَصَرِّفُوْنَ فِي الْقُرْبِ اِلَى اللّٰهِ وَ نَفْعِ الزَّائِرِيْنَ بِحَسْبِ مَعَارِفِهِمْ . وَاَسْرَارِهِمْ .

অর্থ ঃ "কবর ও মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা মুস্তাহাব কিনা? যেমন আজকাল (শামীর যুগ) হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ) ও সাইয়েদ বাদাভী (রহঃ)-এর মাজার জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে দূর দূরান্ত থেকে লোকজনের আগমন ঘটে থাকে। আমি (শামী) আমাদের হানাফী মাজহাবের কোন ইমামের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বা বর্ণনা এ বিষয়ে পাইনি। অবশ্য শাফিয়ী মাজহাবের কোন কোন ইমাম এই সফর নিষেধ করেছেন। তাঁরা তিন

মসজিদ ব্যতিত অন্যান্য মসজিদের ভ্রমন সম্পর্কে নবী করিম (দঃ)-এর নিষেধাজ্ঞার উপর অনুমান করেই এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু শাফিয়ী মাজহাবের অন্যতম ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) মসজিদ ও মাজারের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রমান করে ঐসব আলিমদের মতামতকে এভাবে খন্ডন করে দিয়েছেন— "কেননা, আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও জিয়ারত কারীদের জন্য উপকারের ক্ষেত্রে অলী-আল্লাহগন ভিন্ন ভিন্ন তাছিরের হয়ে থাকেন তাঁদের মারেফাত ও গোপন রহস্যের অনুপাতে।" অর্থাৎ –এক এক অলী-আল্লাহর মারেফাত ও গোপন রহস্য এক এক রকমের হয়ে থাকে। কিন্তু তিন মসজিদ ব্যতিত সব মসজিদই ফজিলতের ক্ষেত্রে এক সমান। অতএব অলী-আল্লাহ গনের মাজার সমূহকে মসজিদের সাথে তুলনা করা ঠিক নয়। ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) ব্যাখ্যা অনুযায়ী যারা মসজিদের জিয়ারতের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা মূলক হাদীসের উপর নির্ভর করে মাজার জিয়ারতের সফরকেও নিষেধ করেছেন তাদের ফতোয়া সঠিক নয়। দুটি ভ্রমন এক পর্যায়ের নয়। তিন মসজিদ ব্যতিত অন্যান্য মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা স্পষ্ট হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ। কিন্তু কবর বা মাজার জিয়ারত সম্পর্কে কোন নিষেধমূলক হাদীস নেই। বরং ৩নং দলীলে বর্ণিত হাদীসে সকল কবর জিয়ারতের জন্য নবী করিম (দঃ) স্পষ্টভাবে অনুমতি দিয়েছেন।

সুতরাং ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর জন্মের বহু পূর্বে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) মাজার জিয়ারতের বিষয়টি খোলাসা করে ফয়সালা করে গেছেন। এর বিরুদ্ধে উক্ত দুই ওহাবীর মতামত তুফানের সম্মুখে খরকুটার ন্যায় প্রতিভাত।

মাজার জিয়ারত সম্পর্কে ভ্রান্ত মতামত খন্ডন

(১) মাজার জিয়ারতের বিরুদ্ধবাদীগন মিশকাত শরীফ বাবুল মাছাজিদ-এর একখানা হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। যথাঃ

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلٰثَ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِىْ هٰذَا ـ

লা-তু সাদ্দুর রিহালু ইল্লা ইলা-সালাছে মাছাজিদা, - মাছ জিদিল হারামে ওয়াল মাছ জিদিল আকছা, ওয়া মাসজিদি হাজা।

অর্থঃ "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ তিন মসজিদ ব্যতিত সফর করা যাবেনা। এগুলো হলো– মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী)।" (আল হাদীস, মিশকাত–মসজিদ অধ্যায়)।

তাদের মতে উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, উল্লেখিত তিন মসজিদ ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সফর করা যাবেনা। সুতরাং মাজারের উদ্দেশ্যে সফর করাও হারাম।

মতামতঃ হাদীসটি মসজিদ সম্পর্কীত। এর সাথে মাজারের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা হাদীসে বর্ণিত আরবী শব্দ اِلَّا (ইল্লা) কে হরফে ইস্তিস্না বলা হয়। এর পূর্বে বসে মুস্তাসনা মিনহু এবং পরে বসে মুস্তাস্না। পূর্বের ও পরের উভয়টি একজাতীয় হলে তাকে বলা হয় মুস্তাস্না মোত্তাসিল। বর্ণিত হাদীসে যেহেতু মুসতাসনাটি অর্থাৎ তিন মসজিদ হলো মোত্তাসিল। সুতরাং মুসতাস্নামিনহুটিও হবে একই জাতীয় অর্থাৎ অন্যান্য মসজিদ। আরবী গ্রামারের সুত্র অনুযায়ী হাদীস খানার প্রকৃত অর্থ হবে এরূপঃ "তিন মসজিদ ব্যতিত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবেনা।" আজকাল তবলীগ জামাত বিভিন্ন মসজিদে গাশ্ত করে থাকে। সুতরাং হাদীস খানা হচ্ছে মসজিদ সম্পর্কীত এবং তাদের মসজিদের গাশতের বিরূদ্ধে। এর সাথে মাজারের কোনই সম্পর্ক নেই। বুখারী ও মুসলিম শরীফে "মসজিদ" শিরোনামে উক্ত হাদীসখানা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু "জিয়ারত" শিরোনামে বর্ণিত হয়নি। মসজিদ সম্পর্কীত হাদীস-মাজারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অবৈধ।

তদুপরি যদি বিরুদ্ধবাদীদের ব্যাখ্যা সঠিক বলে ধরেও নেয়া হয়, তাহলে শুধু মাজার কেন? অন্যান্য সফরও তো এই হাদীস দ্বারা হারাম হয়ে যাওয়ার কথা যেমন শিক্ষা, ব্যবসা, বাণিজ্য, চিকিৎসা, ভ্রমন ও বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে দূর দেশে গমন করা (সফর) সবই হারাম হবে। অথচ বিরুদ্ধবাদীগণ এ সমস্ত সফরকে হারাম বলেন না। তাহলে শুধু মাজারকে টার্গেট করার উদ্দেশ্য কি? হাদীসে কি এ ধরণের ইঙ্গিত আছে? নাই। ইতিপূর্বে অধ্যায়ের শুরুতে প্রমান করা হয়েছে যে, স্বয়ং কুরআন মজিদে বিভিন্ন সফরের কথা উল্লেখ রয়েছে। তদুপরি হাদীস শরীফে নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র রওজা মোবারকের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরের

ফজিলত ও বর্ণনা করা হয়েছে যা ১নং ও ২নং দলীলে উল্লেখিত হয়েছে। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) কর্তৃক ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিন থেকে বাগদাদ শরীফের সফরের উল্লেখও ৫নং দলীলে বর্ণিত হয়েছে। হযরত বেলাল (রাঃ) কর্তৃক সিরিয়া হতে মদিনা শরীফে হুজুর (দঃ)-এর রওজা মোবারকের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার প্রমান এবং রওজা মোবারকের উপর কপাল ঘর্ষনের প্রমান ৪নং দলীলে বর্ণনা করা হয়েছে। উপস্থিত সাহাবাগন কেহই এব্যাপারে নিষেধ করেননি। শেষে ফতোয়ায়ে শামীর এবারত দ্বারা ইমাম গাজ্জালীর মতামত, বিরুদ্ধবাদীদের মতামত খন্ডন ও অলি আল্লাহগনের মাজারের ভিন্ন ভিন্ন তাছির বা প্রভাবের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় জিয়ারত বিরোধীদের কথা সত্য ধরে নিলে এসব সফর হারাম হয়ে যায়। অথচ কুরআন হাদীস ও ফেকাহর কিতাবাদি দ্বারা ঐ সব সফর জায়েজ ও উত্তম বলে প্রমানিত হয়েছে।

বিরুদ্ধবাদীদের দলীলস্বরূপ বর্ণিত হাদীসের প্রকৃত ব্যাখ্যাঃ মিশকাতে বর্ণিত উক্ত হাদীস খানার প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে হাদীস বিশারদগন কি ব্যাখ্যা করেছেন-তা শুনুন।

(১) পাক ভারতের সর্ব প্রথম ও সর্বজন স্বীকৃত মোহাদ্দেছ শেখ আবদুল হক দেহলভী (রহঃ) বলেনঃ

وبعضے از علماء گفته اند که سخن در مساجد است یعنی در مسجدے دیگر جز ایں مساجد سفر جائز نه باشد ۔ و اما مواضع دیگر جز مساجد خارج از مفهوم ایں کلام است (اشعة اللمعات)

অর্থাৎ ঃ "কোন কোন আলিমগণ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এই হাদীসে শুধু মসজিদ সম্পর্কেই নিষেধ বলা হয়েছে। অর্থাৎ বাইতুল্লাহ, বাইতুল মাকদাছ ও মসজিদে নববী ব্যতিত অন্যান্য মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ নয়। কিন্তু মসজিদ ব্যতিত অন্যান্য স্থানের সফর এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয় বা হারাম নয়।" (আশিয়াতুল লুমআত)। শেখ আবদুল হক দেহলভী (রহঃ) -এর ব্যাখ্যার পর ওহাবী সম্প্রদায়ের অপ ব্যাখ্যার মূল্য কতখানি, তা বিবেচ্য বিষয়।

(২) ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) উক্ত হাদীস খানার যে ব্যাখ্যা "তাঁর রচিত 'ইহ্‌ইয়াউল উলুম' গ্রন্থে প্রদান করেছেন, তা এত মূল্যবান যে, মুসলিম শরীফের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ শরাহ্ "নববী" তে উক্ত এবারত খানাকে দলীল হিসাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আর মোল্লা আলী কারী (রহঃ) আল্লামা নববীর উক্ত উদ্ধৃতি স্বীয় গ্রন্থ "মিরকাত শরহে মিশ্‌কাত" এর মধ্যে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। যথাঃ

وفي شرح المسلم للنووي قال ابو محمد يحرم شد الرحال الى غير الثلثة وهو غلط . وفي الاحياء ذهب بعض العلماء الى الاستدلال على المنع من الرحلة لزيارة المشاهد وقبور العلماء والصالحين وما تبين لي ان الامر ليس كذلك بل الزيارة مامور بها لخبر الا فزوروها انما ورد نهيا عن الشد بغير الثلثة من المسجد لتماثلها واما المشاهد فلا تساوي بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله هل يمنع ذلك القائل عن شد الرحال لقبور الانبياء كابراهيم وموسى ويحيى والمنع من ذلك في غاية الاحالة . والاولياء في معناهم فلا يبعد ان يكون ذلك من اغراض الرحلة كما ان زيارة العلماء في الحيوة . (مرقاة شرح مشكوة باب المساجد)

অর্থঃ "মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেনঃ মুসলিম শরীফের শরাহ, শরহে নববীতে আল্লামা নববী (রহঃ) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, আবু মুহাম্মদ -এর মতে, তিন মসজিদ ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম। কিন্তু তার এই মত সঠিক নয় বরং সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা ইহ্‌য়াউল উলুম গ্রন্থে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেছেনঃ "উক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করে যদিও কোন কোন আলিম বরকতময় স্থান সমূহ এবং বিজ্ঞ উলামা ও অলি-আল্লাহগনের মাজার সমূহ জিয়ারতের নিয়তে সফর করাকে নিষেধ করেছেন, কিন্তু আমার মতে (গাজ্জালী) ব্যাপার তা নয়। বরং মাজার এবং বরকতময় ও পবিত্র স্থানসমূহ জিয়ারত করার নির্দেশই পৃথক অন্য হাদীসে

উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটি হচ্ছে– "তোমরা কবর জিয়ারত কর"। আর তিন মসজিদ সম্পর্কীত হাদীস খানায় বলা হয়েছে যেহেতু অন্যান্য মসজিদ সমূহ ফজিলতের দিক থেকে সমান ফজিলতের। সুতরাং ঐগুলি নিয়ত করে সফর করাতে বাড়তি কোন ফজিলত নেই। এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে অলী-আল্লাহগনের মাজার জিয়ারত নিষিদ্ধ হতে পারে না। কেননা পবিত্র স্থানসমূহ এবং মাজার সমূহের সবগুলো এক পর্যায়ের নয়। বরং ঐগুলোর মর্যাদা পৃথক পৃথক। সুতরাং ঐগুলোর বরকত ও ফজিলত আল্লাহর নিকট ভিন্ন ভিন্ন। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) আরও বলেনঃ "তবে কি মসজিদের হাদীস দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত মুছা (আঃ) এবং হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) ও অন্যান্য পয়গাম্বরগনের মাজার জিয়ারতও নিষিদ্ধ বলে গন্য হবে? কখনও নয়। কাজেই নবীগণের মাজার জিয়ারত করা যেমন ঐ হাদীসের দ্বারা নিষিদ্ধ নয়, তেমনিভাবে অলী-আল্লাহ গণের মাজার জিয়ারতও নিষিদ্ধ নয়। কেননা, অলী আল্লাহগণ, নবীগণেরই উত্তরাধিকারী। উভয়ের হুকুমই এক। সুতরাং নবীগণের রওজা মোবারক জিয়ার ত করার মধ্যে যেমন একটি উদ্দেশ্য থাকে, তেমনিভাবে অলী-আল্লাহগণের মাজার জিয়ারতের মধ্যেও একটি খাস উদ্দেশ্য থাকতে পারে। এতে কোন অসম্ভব কিছুই নেই। জীবদ্দশায় অলী-আল্লাহগণের দরবারে গমন করার মধ্যে যেমন একটি খাস উদ্দেশ্য থাকে, তেমনিভাবে তাদের ইনতিকালের পরে তাঁদের মাজার জিয়ারতের মধ্যেও খাস উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।"

(মিরকাত শরহে মিশকাত– মসজিদ অধ্যায়)

২নং আপত্তি ও তার খন্ডনঃ

মাজার জিয়ারত বিরোধীদের আর একটি আপত্তি হলোঃ আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর রহমত ও সর্বত্র বিদ্যমান। সুতরাং খোদার রহমত পাওয়ার জন্য, অলী-আল্লাহগণের মাজারে যাওয়ার প্রয়োজন কি? দেওয়ার মালিকতো আল্লাহ। অন্যের কাছে চাওয়ার প্রয়োজন কি?

জবাবঃ তাদের এই বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্নের অনেক জবাব আছে। নিম্নে কয়েকটি দেয়া হলো।

(১) আল্লাহ সর্বত্র হাজির– একথা ঠিক! তিনি রহমত দাতা-একথাও ঠিক। কিন্তু আল্লাহর অলীগণ হচ্ছেন খোদার রহমতের দরজা। দরজার মাধ্যমেই খোদার রহমত পাওয়া যায়। যেমন রেলগাড়ী পুরা লাইনে চলে।

কিন্তু তাকে ধরার জন্য রেল ষ্টেশনে যেতে হয়। যেখানে সেখানে ধরা যায়না। ঠিক তদ্রুপ খোদার রহমত প্রাপ্তির ষ্টেশন হলো অলী-আল্লাহর দরবার। যেমন রোগ নিরাময়কারী তো আল্লাহ। কিন্তু যেতে হয় ডাক্তার খানায় ও হাস্‌পাতালে। ঘরে বসে থাকলে তো রোগ ভাল হবেনা। রিজিকদাতা আল্লাহ। কিন্তু রিযিকের অনুসন্ধান করতে হয় ক্ষেত খামারে, চাকুরী ক্ষেত্রে, অফিস আদালতে। ঘরে বসে থাকলে কি খোদা তায়ালা ঘরে এনে রিজিক দিয়ে যাবেন? স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কক্স বাজার, দার্জিলিং ইত্যাদি স্বাস্থনিবাসে যেতে হয়। ইল্‌মে লাদুন্নী বা ইল্‌মে গায়েবের মালিক আল্লাহ। কিন্তু হযরত মুছা (আঃ) এই ইল্‌ম শিক্ষা করার জন্য হযরত খিজির (আঃ)-এর কাছে গেলেন কেন? সন্তান দেয়ার মালিক তো আল্লাহ। কিন্তু জাকারিয়া (আঃ) বিবি মরিয়ম (আঃ)-এর হুজরায় দাঁড়িয়ে কেন খোদার কাছে সন্তান চাইলেন? কুরআন মজিদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত জাকারিয়া (আঃ) বিবি মরিয়মের কামরায় দাঁড়িয়ে খোদার কাছে সন্তান কামনা করেছিলেন। (সুরা আল ইমরান)। এতেই প্রমানিত হলো যে, বিবি মরিয়মের মত অন্যান্য অলি আল্লাহগণের মাজারে গিয়েও দুয়া করলে সহজেই কবুল হয়। অলীগণের মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যও তাই। কোরান মসজিদে এর উদাহরণ বিদ্যমান। সুতরাং মাজার জিয়ারতের সফরকে হারাম বলা কুরআনের অবমাননার শামিল।

(২) দ্বিতীয় জবাব হলোঃ আল্লাহ রিজিকদাতা। চাইতে হলে তার কাছে চাবেন। ধনী লোকের বাড়ীতে গিয়ে আপনারা সদকা-জাকাত ও গরুর চামড়া চান কেন?

প্রসঙ্গ ক্রমে জনৈক ওহাবী আলিম, অলী-আল্লাহগণের মাজারে গিয়ে তাঁদের মাধ্যমে কিছু চাওয়ার বিরুদ্ধে একটি কবিতাংশ লিখেন এভাবেঃ

وہ کیا چیز ہے جو نہیں ملتی خدا سے # جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے

অর্থাৎ– এমন কোন বস্তু আছে যা খোদার কাছে চাইলে পাওয়া যায়না? অথচ তোমরা (ছুন্নী মুসলামানগণ) ঐগুলি প্রার্থনা করছো অলী-আল্লাহদের কাছে?

এর উত্তরে সুন্নী এক আলিম তৎক্ষনাৎ একটি কবিতাংশ রচনা করে বললেনঃ

وُہ چندہ جو نہیں ملتا خدا سے # جسے تم مانگتے ہو
اغنیاء سے

অর্থাৎ- তোমরা (ওহাবীরা) যেই চাঁদা ধনীদের কাছে প্রার্থনা করছো! এটাই সম্ভবতঃ খোদার কাছে নেই। তা না হলে, তোমরা ধনীদের ঘরে ধর্না দিচ্ছো কেন? খোদার কাছে কিসের অভাব?

৩নং আপত্তি ও তার খন্ডনঃ

তাদের তৃতীয় দলীল হলোঃ হুদাইবিয়ার ময়দানে নবী করিম (দঃ) একটি বাবলা গাছের নীচে বসে সাহাবাগণের নিকট থেকে জেহাদের বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সাহাবীগণ ঐ গাছটিকে পবিত্র মনে করে তার জিয়ারত করতেন। হযরত ওমর (রাঃ) ঐ জিয়ারতের গাছটি কেটে ফেলেছিলেন- যেন শিরক না হতে পারে। অতএব অলী-আল্লাহগণের মাজার ও চিল্লার স্থান জিয়ারত করা হযরত ওমরের ছুন্নতের খেলাফ।ঐ স্থানটিকে ধ্বংস করে দেয়াই বরং হযরত ওমরের ছুন্নাত।

জবাবঃ হযরত ওমর (রাঃ) ঐ বাবলা গাছটি কাটেননি। বরং ঐ গাছটি কুদরতি ভাবেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণ অন্য একটি বাবলা গাছকে এই গাছ মনে করে জিয়ার ত করতেন। মানুষের এই ভুল ভাঙ্গানোর জন্যই হযরত ওমর (রাঃ) এ গাছটিকে কেটে ছিলেন। এটা রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর ঐ বৃক্ষ ছিলনা। প্রমান স্বরূপ বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড; বাইয়াতুর রিদওয়ান বা হুদাইবিয়ার যুদ্ধ অধ্যায়ে এবং মুসলীম শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, বাইয়াতুর রিদওয়ান অধ্যায়ে, হযরত ছায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ

كَانَ اَبِىْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فِىْ قَابِلٍ حَاجِّيْنَ فَخَفِىَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا وَ فِى الْبُخَارِىْ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِيْنَاهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا .

অর্থঃ "ইবনে মুসাইয়েব (রাঃ) বলেন- বাবলা গাছের নীচে যেসব সাহাবী নবী করিম (দঃ)-এর নিকট বাইয়াত করেছিলেন- তাঁদের মধ্যে

আমার পিতাও (মুসাইয়েব) একজন ছিলেন"। আমার পিতা বর্ণনা করেছেনঃ পরবর্তী বৎসরে (৭ম হিজরী) আমরা হজ্ব (ওমরাতুল ক্বাজা) করতে গেলাম। কিন্তু ঐ গাছের জায়গাটি আমাদের থেকে গায়েব হয়ে যায়। বুখারী শরীফের এবারত হচ্ছেঃ "আমরা যখন পরবর্তী বৎসরে গমন করি, তখন ঐ গাছটি আমরা ভুলে যাই এবং ঐ গাছটি উদ্ধার করতে পারিনি"। উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমানিত হলো যে, প্রকৃত বাবলা গাছটি কুদরতিভাবেই লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। কিন্তু লোকজন অন্য একটি গাছকে ঐ গাছ মনে করে তার জিয়ারত করতে থাকেন— বরকত লাভের আশায়। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁদের ভুল ভাঙ্গানোর উদ্দেশ্যেই ঐ গাছটি কেটে ফেলেন। অতএব হযরত ওমর (রাঃ) প্রকৃত গাছটি কেটে ফেলেছেন- একথা বলা ঠিক নয়। হযরত ওমর (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর ঐতিহাসিক নিদর্শন ধংস করতে পারেন না। উদাহরণ স্বরূপঃ নবী করিম (দঃ)-এর অনেক নিদর্শন মদিনা শরীফে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) ঐগুলি ধ্বংস করেন নি। নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র চুল, দাঁড়ি, নখ, ঘাম, রুমাল ও অন্যান্য নিদর্শন সমূহ যুগ যুগ ধরে বিদ্যমান ছিল এবং এখনও আছে। যেমন, হযরতবাল মসজিদে সংরক্ষিত পবিত্র চুল মোবারক, দিল্লীর জামে মসজিদে সংরক্ষিত দাঁড়ি মোবারক, বিভিন্ন স্থানে কদম রসূল ইত্যাদি নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু আফসোসের বিষয়, নবী করিম (দঃ)-এর নিজ হাতে লাগানো, হযরত সালমান ফারছী (রাঃ)-এর বাগানের একটি খেজুর গাছ বাদশাহ খালেদ কর্তন করে ফেলেছে। তাদের মতে তিনি শিরক এর উৎস উৎপাটন করে দিয়েছেন। সুতরাং অলীগণের মাজার ধ্বংস নয় বরং সংরক্ষণ করাই সাহাবীগণের ছুন্নাত।

তৃতীয় অধ্যায়

আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারের উপর ছাদ ও গম্বুজ নির্মান করা, মাজার পাকা করা এবং চতুস্পার্শে দেওয়াল নির্মান করা জায়েজ।

১নং দলিল ঃ আল্লাহ তায়ালা আসহাবে কাহাফ -এর মাজার সম্পর্কে সূরা কাহাফে ঘোষণা করেছেন—

قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔

অর্থাৎ "যারা আপন কাজে বিজয়ী হয়েছে, তারা বলল– আমরা অবশ্যই আসহাবে কাহাফের মাজারের উপর একটি মসজিদ নির্মান করবো।" উক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অলীগণের মাজারের আশে পাশে ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মান করা, তিলাওয়াত ও জিয়ারতের সুবিধার্থে মাজারের উপর ছাদ ও গম্বুজ নির্মান এবং চতুস্পার্শে দেওয়াল তৈরি করা যায়েজ ও বৈধ। কেননা, আসহাবে কাহাফ ছিলেন আউলিয়া। মসজিদ বা ইবাদত খানা নির্মানের পটভূমিকায় আসহাবে কাহাফের উল্লেখ থাকলেও এর আওতায় সমস্ত অলীগণই শামিল। উসূলের বিধান অনুযায়ী শানে নুযুল খাস হলেও হুকুম আম বা সকলের বেলায় প্রযোজ্য। মাজার সংলগ্ন মসজিদ বা ইমারত নির্মানের বর্ণনাটি প্রশংসামূলক হিসাবে কুরআন মজিদে উল্লেখিত হয়েছে। পূর্ববর্তী কোন ঘটনার প্রসংসা সূচক বর্ণনা উহার বৈধতারই প্রমাণ। (তফসীরে রুহুল বয়ান)

২নং দলিল ঃ ফিকাহর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুররুল মুখতার যানাজা অধ্যায়ে বর্ণিত আছেঃ ولا يرفع عليه بنا وقيل لا بأس به وهو المختار۔

অর্থাৎ " কোন কোন মতে কবরের উপর ইমারত নির্মান করা উচিৎ নহে। কিন্তু অন্য একটি মতে ইমারত নির্মানে কোন ক্ষতি নেই বা দোষণীয় নহে বলে উল্লেখ আছে। শেষোক্ত মতই ফতোয়া হিসাবে গৃহীত হয়েছে।" অতএব বিভিন্ন মতভেদ থাকা সত্বেও মাজারের উপর ইমারত নির্মান করা যে দোষ-নীয় নয় ইহাই চূড়ান্ত রায় এবং ইহার উপরই আমল করতে হবে। (দুররুল মুখতার জানাজা অধ্যায়)

৩নং দলিল ঃ জগৎ বিখ্যাত ফতোয়ায়ে শামী ১ম খন্ড (মিসরে মুদ্রিত) ৯৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছেঃ

وفي الاحكام عن جامع الفتاوى وقيل لا يكره البناء اذا كان الميت من المشائخ والعلماء والسادات۔

অর্থাৎ "জামেউল ফাতাওয়ার বরাতে 'আহকাম' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি মৃতব্যক্তি পীর-অলি, উলামা অথবা যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হন, তাহলে তাদের কবরের উপর ইমারত নির্মান করা বৈধ এবং জায়েজ। এতে মাকরুহও হবে না।" উক্ত ফতোয়া অনুযায়ী আউলিয়াগণের মাজারে ইমারত ও গম্বুজ নির্মাণ করা নিঃসন্দেহে জায়েজ বলে প্রমাণিত হলো।

৪ নং দলিল ঃ বিখ্যাত তাফসীরে রুহুল বয়ান পৃষ্ঠা ৮৭৯ ও মাজমাউল বিহার ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৮৭ এ উল্লেখ আছেঃ

وقد اباح السلف ان يبنى على قبور المشائخ والعلماء والمشاهير ليزورهم الناس ويستريحون بالجلوس فيه۔

অর্থাৎ 'পীর মাশায়িখ, উলামা ও যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বর্গের মাজারে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে এবং সেখানে বসে আরাম করার উদ্দেশ্যে ইমারত নির্মান করাকে ইসলামের প্রথম যুগের উলামাগণ মোবাহ ও বৈধ বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন।" উক্ত ইবারতে অতীতের সালফ বলতে মোতাকাদ্দেমীন উলামাদের বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ পুরাতন যুগের উলামাগণের মতে উক্ত ইমারত নির্মান করা যায়েজ। সালাফ বলা হয় সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীনের যুগকে এবং খালফ বলা হয় তার পরবর্তী যুগকে।

৫ নং দলিল ঃ পাক ভারত উপমহাদেশের সর্বজনমান্য শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'জজবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব' উল্লেখ করেছেন--

مزارات پر قبہ بنانا صحابہ وسلف صالحین سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضہ اور انکے بعد دوبارہ حضرت عمر بن عبد العزیز رح نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر مکان اور عالی شان گنبد بنایا ہے

অর্থাৎ "মাজারের উপর ইমারত নির্মান করা সাহাবায়ে কেরাম ও প্রথম যুগের বুজুর্গানে দ্বীনের কর্মের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম- এর রওজা মোবারকের উপর সর্ব প্রথম হযরত ওমর (রাঃ) এবং দ্বিতীয় বার হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহঃ) ইমারত ও আলীশান গম্বুজ নির্মান করেছিলেন।"

৬ নং দলিল ঃ বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড যানাজা অধ্যায়ে আছে ঃ

"হযরত রাসূল করীম (দঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-ও হযরত ওমর (রাঃ) -এর রওজা মোবারক সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, উমাইয়া খেলাফতের ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের যুগে (৮৬ হিজরীতে) একবার রাসূলুল্লাহ (দঃ)- এর রওজা মোবারকের এক দিকের দেওয়াল ধসে গেলে সাহাবায়ে কেরাম উহা মেরামত শুরু করে দিলেন। মেরামতের কাজের সময় হঠাৎ এক খানা পবিত্র পা দৃষ্টিগোচর হলো। উপস্থিত লোকজন মনে করলেন—হয়তোবা ইহা রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর পা মোবারক হতে পারে। কিন্তু তথায় উপস্থিত হযরত ওরওয়া (রাঃ) (হযরত আয়েশার ভাগিনা) সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ

لا واللّٰه ما هِىَ قدم النبى عليه السلام ماهى الا قدم عمر -

অর্থৎ- না, খোদার শপথ, ইহা নবী করিম (দঃ)-এর কদম মোবারক নহে। ইহা তো হযরত ওমর (রাঃ)-এর পা"। উক্ত ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সর্বপ্রথম সাহাবায়ে কেরামগণই নবী করীম (দঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর মাজার শরীফ পাকা করেছিলেন এবং চতুস্পার্শে দেওয়াল দ্বারা আবৃত করেছিলেন। যখন উক্ত ইমারতের একদিকের দেওয়াল ধসে যায়, তখন সাহাবাগন পুনরায় উহা মেরামত করান। এখানে আরও লক্ষনীয় যে, উক্ত ইমারতের মধ্যে একজন নবী এবং দুইজন সাহাবীর কবর শরীফ অবস্থিত। যদি অলিগণের কবর পাকা করা ও গম্বুজ নির্মান করা অবৈধ হতো, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম কখনই উহা করতেন না। অতএব দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হলো যে, অলীগণের মাজার পাকা পোক্ত করা শুধু জায়েজই নহে, বরং সুন্নাতও বটে। অনেক সাহাবীগণই বিভিন্ন বুজর্গদের মাজার পাকা করেছেন। যেমন- হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে উম্মুল মুমিনীন হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-এর মাজারের উপর গম্বুজ নির্মান করেছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) মক্কা শরীফে অবস্থিত তাঁর ভাই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ)-এর কবরের উপর গম্বুজ নির্মান করিয়েছিলেন। তায়েফে অবস্থিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ)-এর কবরের উপর বিশিষ্ট তাবেয়ী মুহাম্মাদ বিন হানফিয়া (রহঃ) গম্বুজ নির্মান করেছিলেন (মুনতাকা শরহে মুয়াত্তা ও বাদায়ে সানায়ে)। হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এর পুত্র দ্বিতীয় হাসান (রাঃ) ইনতিকাল করলে তাঁর বিবি তাঁর মাজারে একটি কোব্বা তৈরী করেন এবং এক বৎসর পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। কোন সাহাবী এতে বাঁধা দেন নি (বুখারী ১ম খণ্ড কিতাবুল যানায়েজ। সুতরাং সাহাবীগণের আমল ছারাই মাজারের উপর ইমারতনির্মাণের বৈধতা প্রমাণিত হলো।

চতুর্থ অধ্যায়

মাজারে মোমবাতি জ্বালানো এবং আলোক সজ্জা করা জায়েজ

১ নং দলিল ঃ মিশরের প্রসিদ্ধ হানাফী মুফতী আল্লামা আবদুল কাদের (রহঃ) রচিত তাহ্রীরুল মুখতার গ্রন্থের ১ম খণ্ড ১২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছেঃ

وَلِذَا (أمر جائز) إيقَادُ الْقَنَادِيلِ وَالشَّمعِ عِنْدَ قُبُورِ الاولياء وَالصُّلحَاءِ مِنْ بَابِ التَّعْظِيْمِ وَالاجْلَالِ أَيْضًا - فَالْمَقْصَدُ فِيْهَا مَقْصَدٌ حَسَنٌ وَنَذْرُ الزَّيْتِ وَالشَّمْعِ لِلْأَوْلِيَاءِ يُوْقَدُ عِنْدَ قُبُوْرِ هِمْ تَعْظِيْمًا لَّهُمْ وَمَحَبَّةً فِيْهِمْ جَائِزٌ أَيْضًا - لَا يَنْبَغِى النَّهِىُ عَنْهُ -

অর্থাৎ "অনুরূপভাবে সম্মানার্থে ও মর্যাদা প্রদর্শনার্থে আওলিয়ায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনের মাজারের উপর ঝাঁলর লটকানো ও মোমবাতি জ্বালানো জায়েজ। কেননা, একাজের উদ্দেশ্য মহৎ। আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারে জ্বালানোর উদ্দেশ্যে মোমবাতি ও তৈলের মান্নত করাও জায়েজ। কেননা, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মাজারের অলীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁদের প্রতি ভালবাসার নিদর্শন। একাজে নিষেধ করা বা বাধা দেয়া অনুচিত (তাহরিরুল মুখতার)।"

২নং দলিল ঃ বিশ্ববিখ্যাত আলিম ও ফতোয়া শামী ইবনে আবেদীন (রাঃ)-এর ওস্তাদ আল্লামা আবদুল গনি নাবলুসি (রঃ)-এর লিখিত হাদিকাতুন নাদিয়া নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ

إخْرَاجُ الشُّمُوعِ الَى الْقُبُوْرِ بِدْعَةٌ وَاتْلَافُ مَالٍ كَذَافِى الْبَزَّازِيَّةِ وَهٰذَا اِذَاخَلَا عَنْ فَائِدَةٍ وَاَمَّا اِذَا كَانَ مَوْضَعُ الْقُبُوْرِ مَسْجِدًا أَوْ عَلٰى طَرِيْقٍ أَوْكَانَ هُنَاكَ أَحَدٌ جَالِسٌ أَوْكَانَ قَبْرُ وَلِىٍّ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ أَوْعَالِمٍ مِّنَ الْمُحَقِّقِيْنَ تَعْظِيْمًا بِرُوْحِهِ الْمُشْرِقَةِ عَلٰى تُرَابِ جَسَدِهِ كَاشْرَاقِ الشَّمْسِ عَلَى الْأَرْضِ اِعْلَامًا لِلنَّاسِ أَنَّهُ وَلِىٌّ لِيَتَبَرَّكُوْا بِهِ وَيَدْعُوْ اللّٰهَ تَعَالٰى عِنْدَهُ فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ فَهُوَ أَمْرٌ جَائِزٌ لَا مَانِعَ مِنْهُ فَاِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -

অর্থাৎ "মাজারের নিকট মোমবাতি নিয়ে যাওয়া ও জ্বালানোকে বিদ্‌আত ও অপব্যয় বলে বাজ্জাজিয়া নামক ফেকাহর কিতাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু এটা তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন বাতি নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোন ফায়দা না থাকে। কিন্তু যদি কবরস্থানে কোন মসজিদ থাকে, অথবা কবর যদি চলাচলের রাস্তার উপর হয়, অথবা কোন লোক যদি তথায় বসা থাকে, অথবা উক্ত কবর যদি কোন পীর বুজুর্গের কবর হয় অথবা গভীরজ্ঞান সম্পন্ন কোন আলিমের কবর হয়, যাদের পবিত্র আত্মা জগত আলোকময়ী সূর্যের মত কবর রৌশনকারী– তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে যদি কবর আলোকিত করা হয় এবং তাঁরা যে আল্লাহর অলী ,তাঁদের থেকে বরকত লাভ করা উচিত এবং তাঁদের নিকট আল্লাহর দরবারে দোয়া করলে তা কবুল হয়-একথা লোকদের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্যে তাঁদের কবরে আলোক সজ্জা করা বৈধ কাজ। এতে নিষেধাজ্ঞার কিছুই নেই। কেননা নিয়্যত অনুযায়ীই কর্মফল হয়ে থাকে"।

আল্লামা নাব্‌লূসীর উপরোক্ত ফতোয়ায় কোন্ কোন্ কবরে বাতি জ্বালানো জায়েজ তার সংক্ষিপ্ত সার ঃ (১) কবরের সাথে মসজিদ থাকলে (২) কবর যদি চলাচলের রাস্তার উপর হয় (৩) কোন জিকির কারী লোক যদি মাজারে থাকে (৪) উক্ত মাজার যদি অলী বুজুর্গ ও বিজ্ঞ আলেমের মাজার হয় (৫) তাদের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বাতি জ্বালানো (৬) মানুষের কাছে একথা প্রচার করা যে, তারা প্রকৃতই অলি এবং তাদের মাজার থেকে বরকত লাভ করা উচিৎ (৭) তাদের মাজারে সহজে দোয়া কবুল হয়।

উক্ত এবারতের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হলো যে, আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারে কোন শর্ত ছাড়াই বাতি জ্বালান বৈধ ও যায়েজ। এর উদ্দেশ্য শুধু তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

৩ নং দলীল ঃ মদিনা মুনাওয়ারার রওজা মোবারকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর মাজার শরীফে বর্তমানেও বাতি জ্বালানো হয়। তুরস্কের খিলাফত যুগে আরবের সমস্ত সাহাবায়ে কেরামও আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারে জিয়ারতের সুবিধার জন্য বাতি জ্বালানো হতো। কিন্তু সৌদী আরবের বর্তমান ওহাবী সরকার ক্ষমতা বলে তা বন্ধ করে দিয়েছে এবং সমস্ত মাজারিও ধ্বংস করে ফেলেছে। অথচ আরব দেশের অন্যান্য রাষ্ট্রের মাজারে বর্তমানেও বাতি জ্বালানো হয়ে থাকে।

উদাহরন স্বরূপ ইরাক ও বাগদাদ, কুফা, নজফ, কারবালা ও মুসেল শহরে হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ), ইমাম আবু হানিফা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ), হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম, হযরত শীষ আলাইহিস সালাম ও হযরত আউয়ুব আলাইহিস সালামের পবিত্র মাজার সমূহ রাত্রে অসংখ্য বাতি দ্বারা আলোক সজ্জিত করা হয়। অধম লেখক তাঁদের পবিত্র মাজার সমূহ জিয়ারত করে এ সব চাদর ও বাতি দেখে এসেছে। উপরোক্ত কিতাবের ফতোয়া অনুযায়ী মাজার আলোকময় করা শুধু আরব দেশেই সীমাবদ্ধ নয় বরং পাকিস্তানের দাতা বাবা গঞ্জেবক্স সাহেবের মাজার, হিন্দুস্তানের খাজা আজমিরী (রঃ)-এর মাজার ও বাংলাদেশের অসংখ্য মাজার মোমবাতি ও বিদ্যুতের বাতি দ্বারা আলোকময় করা হয়ে থাকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে ইন্‌শা আল্লাহ।

পঞ্চম অধ্যায়

মাজার গিলাফ দ্বারা আবৃত করা, মাজারে ফুল দেয়া ও আতর গোলাপ ছিটানো জায়েজ

১ নং দলীলঃ মিশ্‌কাত শরীফের "বাবুল খালা" প্রথম অনুচ্ছেদ-এ বর্ণিত এক হাদিসে এসেছেঃ "একবার নবী করীম (দঃ) দু'টি কবরের পার্শ্ব দিয়ে গমন কালে বললেনঃ উভয়ের উপর শাস্তি হচ্ছে। তন্মধ্যে একজনের অপরাধ ছিল, সে প্রস্রাবের ছিটা থেকে নিজকে রক্ষা করতে পারেনি; আর দ্বিতীয়জনের অপরাধ ছিল; সে চোগলখুরী করতো। এ কথা বলেই হুজুর (দঃ) তরুতাজা একটি খেজুর শাখা নিয়ে সেটাকে দুই টুকরা করে প্রত্যেক কবরের উপর এক একটি টুকরা গেড়ে দিলেন এবং বললেনঃ আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা উক্ত খেজুর শাখা না শুকানো পর্যন্ত উভয়ের শাস্তি হালকা করে দিবেন।"

উক্ত হাদিস থেকে ফতোয়া আলমগিরী ও ফতোয়া শামী প্রমান করেছেন যে, যেহেতু খেজুর শাখা তরু-তাজা, সেহেতু প্রত্যেক তাজা শাখা প্রশাখা বা ফুল কবরে স্থাপন করলে কবরের শাস্তি হালকা হবে। সুতরাং মাজারে ফুল বা পুষ্পমাল্য অর্পন করা বা ফুল ছিটিয়ে দেয়া সুন্নাতে রাসূল (দঃ) দ্বারা প্রমাণিত

এবং মোস্তাহাব। অন্যান্য ঘাস বা লতা জাতীয় জিনিস না দিয়ে ফুল দেয়ার মধ্যে সৌন্দর্য বোধের কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই। আর তরুতাজা জিনিস কবরের উপর স্থাপন করার মধ্যে মূল রহস্য হচ্ছে, উক্ত জিনিস আল্লাহর তসবিহ পাঠ করে থাকে, যতক্ষণ সেটা তরুতাজা থাকে। এতে আরও একটি মাসআলা প্রমানিত হলো যে, তরুতাজা ফুল ও শাখা প্রশাখার তসবিহ পাঠের ফলে যখন কবর আজাব হাল্কা হয়ে যায়, তখন মানুষ যদি কবরের পার্শ্বে কুরআন মজিদ ও দুয়া দরূদ পাঠ করেন, তা হলে কবরের আজাব যে বহুগুনে হাল্কা হবে-এতে কোন সন্দেহ নেই। এজন্য প্রত্যেক কবরের বা কবর স্থানের পার্শ্বে কোরান পাঠ বা জিয়ারতের ব্যবস্থা রাখা উচিত। এজন্যই 'তাহ্‌তাবী আলা মারাকিল ফালাহ্' নামক গ্রন্থে ৩৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছেঃ

قَدْ اَفْتَى بَعْضُ الْاَئِمَّةِ مِنَ الْمُتَاَخِّرِيْنَ بِاَنْ مَا اُعْتِيْدَ مِنْ وَضْعِ الرَّيْحَانِ وَالْجَرِيْدِ سُنَّةٌ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ

অর্থাৎ "আমাদের (তাহতাভী) যুগের কোন কোন ইমাম ফতোয়া দিয়েছেন যে, কবরের উপর সুগন্ধ পুষ্পমাল্য অর্পন করা বা খেজুর গাছের শাখা স্থাপন করার যে প্রথা প্রচলিত রয়েছে, তা উক্ত হাদিস দ্বারাই সুন্নাত প্রমাণিত হয়।" অতএব আউলিয়ায়ে কেরাম বা যে কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির কবরে পুষ্পমাল্য অর্পন করা বা ছিটিয়ে দেয়া সুন্নাত ও মোস্তাহাব।

২ নং দলীল ঃ বিশ্ববিখ্যাত ফতোয়ায়ে আলমগীরিতে উল্লেখ রয়েছে-

وَضْعُ الْوَرْدِ وَالرَّيَاحِيْنَ عَلَى الْقُبُوْرِ حَسَنٌ وَاِنْ تَصَدَّقَ بِقِيْمَةِ الْوَرْدِ كَانَ اَحْسَنَ كَذَا فِى الْغَرَائِبِ

অর্থাৎ "কবরের উপর গোলাপ বা যে কোন সুগন্ধ ফুল অর্পন করা উত্তম। আর যদি উক্ত ফুলের সম পরিমান মূল্য দান করে দেয়া হয়, তাহলে আরও উত্তম হবে। গারায়েব নামক ফতোয়া গ্রন্থে অনুরূপ উক্তিই করা হয়েছে।" উক্ত এবারতের দ্বারাও কবরে এবং মাজারে ফুল অর্পণ করা উত্তম বা মোস্তাহাব প্রমাণিত হলো।

৩ নং দলীল ঃ হিন্দুস্তানের মশহুর আলেম মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্মৌভীর মজমাউল ফাতাওয়ায় উল্লেখ আছে ঃ

سبزیتے پھول وغیرہ قبورپرچڑھانا مستحب ہے ۔ (جلد دوم صفحہ٦٧

অর্থাৎ "কবরের উপর সবুজ লতা-পাতা, ফুল ইত্যাদি অর্পনকরা মোস্তাহাব (২য় খণ্ড ৬৭ পৃঃ)

৪নং দলিল ঃ শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রঃ)-এর সুযোগ্য সন্তান হযরত শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) ফতোয়া আজিজী ২য় খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

ولہذا تحسین کردہ اند بعضے نہادن گل بر قبور لیکن گویند کہ تصدق کنند بقیمت گلہا بہتر باشد۔

অর্থাৎ 'কোন কোন উলামা কবরে ফুল অর্পন করাকে উত্তম বলেছেন। কিন্তু ফুলের মূল্য দান করে দেয়াকে আরও উত্তম বলে তাঁরা মন্তব্য করেছেন।" সুতরাং এতেও কবরে পুষ্প অর্পন উত্তম বলে প্রমাণিত হলো।

৫ নং দলীলঃ গিলাফ, পাগড়ী ও কাপড় দ্বারা মাজার আবৃত করা সম্পর্কে তাহরীরুল মুখতার (মিশর) নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ১২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

وَضْعُ السُّتُوْرِ وَالْعَمَائِمِ وَالثِّيَابِ عَلَى قُبُوْرِهِمْ (الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ) اَمْرٌ جَائِزٌ اِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِذٰلِكَ التَّعْظِيْمُ فِىْ اَعْيُنِ الْعَامَّةِ حَتّٰى لَايَحْتَقِرُوْا صَاحِبَ الْقَبْرِ۔

অর্থাৎ 'উলামা, বুজুর্গানও আউলিয়াগনের মর্যাদা এবং সম্মান জনগণের দৃষ্টিতে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এবং তাঁরা যেন কবরস্থ অলীকে হীন মনে না করে -এই উদ্দেশ্যে তাঁদের মাজার সামীয়ানা, পাগড়ী ও গিলাফ দ্বারা আবৃত করা শরীয়তে বৈধ কাজ"।

৬নং দলীল ঃ শামী ৫ম খণ্ড লেবাস অনুচ্ছেদ-এর পরিশিষ্টে ২৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছেঃ

كَرِهَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَضْعَ السُّتُوْرِ وَالْعَمَائِمِ وَالثِّيَابِ عَلَى قُبُوْرِ الصَّالِحِيْنَ وَالْاَوْلِيَاءِ قَالَ فِى فَتَاوَى الْحَجَّةِ وَتُكْرَهُ السُّتُوْرُ عَلَى الْقُبُوْرِ وَلٰكِنْ نَحْنُ نَقُوْلُ الْاٰنَ اِذَا قُصِدَ بِهِ التَّعْظِيْمُ فِىْ عُيُوْنِ الْعَامَّةِ حَتّٰى لَايَحْتَقِرُوْا صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلِجَلْبِ الْخُشُوْعِ وَالْاَدَبِ لِلْغَافِلِيْنَ الزَّائِرِيْنَ فَهُوَ جَائِزٌ لِاَنَّ الْاَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ۔

অর্থাৎ "কোন কোন ফকিহ্‌গণ বুজুর্গান ও আউলিয়ায়ে কেরামের মাজার শামিয়ানা, পাগড়ী ও গিলাফ দ্বারা আবৃত করাকে মকরূহ বলেছেন। ফাতাওয়া হাজজায়ও উল্লেখ আছে যে, কবরে শামিয়ানা টাঙ্গানো মকরূহ। কিন্তু আমাদের (শামী ও মুতাআখ্‌খিরীন উলামাগণের) বর্তমান মত হলো-এ ব্যবস্থার দ্বারা যদি জনসাধারণের দৃষ্টিতে অলীদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যেন জনগণ কবরবাসীকে হীনজ্ঞান না করে এবং অসতর্ক গাফেল জিয়ারত কারীদের মনে নম্রতাও আদব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তা (গিলাফ ইত্যাদি) জায়েজ। কেননা নিয়্যাতের উপরই আমলের ফলাফল নির্ভরশীল। নিয়্যাত যেমন হবে, ফলাফলও তদনুরূপই হবে।"

উপরের ৬টি দলীল দ্বারা আউলিয়াগণের বা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাজারে ও কবরে ফুল অর্পন করা, আতর গোলাপ ছিটানো এবং গেলাফ দ্বারা মাজার আবৃত করার মধ্যে যে মহৎ উদ্দেশ্য কার্যকর রয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়েছে এবং একাজকে শরীয়ত অনুযায়ী মুস্তাহাব ও বৈধ বলে প্রমাণ করা হয়েছে। সুতরাং সন্দেহবাদীদের আর সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাজার চুম্বন করা বা মাজার প্রদক্ষিন করা জায়েজ

১নং দলীল ঃ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৫ পৃষ্ঠায় আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) উল্লেখ করেছেনঃ

نُقِلَ عَنِ الْاِمَامِ اَحْمَدَ رَحِمَهُ اللّٰهِ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَقْبِيْلِ مِنْبَرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقْبِيْلِ قَبْرِهِ قَالَ فَلَمْ اَرَى بِهِ بَأْسًا وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ اَبِى الصَّنَفِ الْيَمَانِىِّ اَحَدِ عُلَمَاءِ مَكَّةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ تَقْبِيْلِ الْمُصْحَفِ وَاَجْزَاءِ الْحَدِيْثِ وَقُبُوْرِ الصَّالِحِيْنَ (مُلَخَّصًا)۔

অর্থাৎ "ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর মিম্বার শরীফ ও রওজা মোবারক চুম্বন করার বৈধতা সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জওয়াবে বলেন; "আমি এতে ক্ষতিকর কিছু দেখছিনা"। মক্কা শরীফের শাফিয়ী মাজহাবভূক্ত উলামাদের মধ্যে অন্যতম আলেম ইবনে আবিস সানাফ ইয়ামানী থেকেও কুরআন মজিদ, হাদীস শরীফের বিশেষ অংশ এবং বুজুর্গানে দ্বীনের মাজার চুম্বন করা বৈধ বলে রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে।"

উল্লেখিত দুইজন উল্লেখযোগ্য ইমামের ভাষ্য অনুযায়ী রাসূল, নবী ও অলীগণের মাজার-এমনকি কুরআন ও হাদীস শরীফের জুজদান চুম্বন করার বৈধতা প্রমাণিত হলো। কুরআন ও হাদীস গ্রন্থের জুজদানের সম্মানের চেয়ে নবী অলীগণের মাজারের মাটি অনেক উত্তম। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মাজারের মাটি লোকেরা তাবারুক হিসাবে ব্যবহার করতো (ইমাম বুখারীর জীবনী)

২নং দলীল ঃ ফতোয়া আলমগিরী "কিতাবুল কারাহিয়াত বাবু জিয়ারাতুল কুবুর"-অধ্যায়ে উল্লেখ আছেঃ

لَابَأْسَ بِتَقْبِيْلِ قَبْرِ وَالِدَيْهِ كَذَا فِى الْغَرَائِبِ۔

"গারায়েব নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তির পক্ষে তার পিতা মাতার কবর চুম্বন করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই"।

সুতরাং অলীগণ যেহেতু পিতা-মাতার চেয়েও সম্মানিত, তাই তাঁদের মাজার শরীফ ও চুম্বন করা বৈধ।

৩ নং দলীল ঃ কবর প্রদক্ষিণ করা বৈধ কিনা এসম্পর্কে মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবীর "হিফজুল ঈমান" নামক পুস্তিকায় জনৈক প্রশ্নকারীর একটি প্রশ্ন নিম্নরূপ ছিল –হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রঃ) কাশফুল কুবুর-এর নিয়ম এরূপ বর্ণনা করেছেন। যে,

وبعده هفت كره طواف كند ودران تكبير بخو اند وأغاز از راست كند وبعده طرف پايان رخساره نهد۔

অর্থাৎ "তারপর কবরকে সাতবার প্রদক্ষিন করবে। এতে তাকবীর বলবে এবং ডান দিক থেকে শুরু করে পায়ের দিকে নিজের চেহারা রাখবে"। এমতাবস্থায় মাজার তাওয়াফ ও প্রদক্ষিণ করা এবং কবরে চেহারা স্থাপন করা জায়েজ কিনা? মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবী সাহেব হেফজুল ঈমান পুস্তিকার ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় উক্ত প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, "শাহ ওয়ালিউল্লাহর (রহঃ) উক্ত তাওয়াফ প্রকৃত পক্ষে শরীয়তের পরিভাষায় কাবা শরীফের নিয়মপদ্ধতির তাওয়াফ নহে। কেননা শরীয়তের পরিভাষায় কাবা ঘরের তাওয়াফের মধ্যে সম্মান ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। আর কবরের তাওয়াফ হচ্ছে শাব্দিক অর্থে। অর্থাৎ নিছবতের বা রূহানী সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কবর প্রদক্ষিণ করা এবং কবরস্থ অলীর রুহানী ফয়েজ লাভ করা। অনুরূপ ভাবে কাশফুল কুবুর-এর নিয়ম হলোঃ ফয়েজ লাভ করার উদ্দেশ্যে এবং রুহানী সম্পর্ক সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কবর প্রদক্ষিণ করা – ইহা জায়েজ।"

পাঠকগণ লক্ষ্য করেছেন যে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহঃ) কবর বা মাজার প্রদক্ষিনের যে তরিকা ও নিয়ম বর্ণনা করেছেন, ওহাবী-নেতা মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবী উক্ত প্রদক্ষিন ও তাওয়াফ করাকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁর হিফজুল ঈমান পুস্তিকার ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়।

সপ্তম অধ্যায়

অলী আল্লাহগনের নিকট রুহানী সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েজ

দলীল ও প্রমাণঃ

১ নং দলীল ঃ তাফসীরে কবীর, তাফসীরে রুহুল বয়ান ও তাফসীরে খাজেন, সুরা ইউসুফ এর فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ۔ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে ঃ

اَلْاِسْتِعَانَةُ بِالنَّاسِ فِىْ دَفْعِ الضَّرَرِ وَ الظُّلْمِ جَائِزَةٌ ۔

অর্থাৎ "কারও জুলুম এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে অন্যলোকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা যায়েজ।"

২ নং দলীলঃ মিশকাত শরীফ "বাবু জিয়ারাতিল কুবুর" নামক অধ্যায়ের পার্শ টীকায় (হাশিয়া) বর্ণিত আছে ঃ

وَاَمَّا الْاِسْتِمْدَادُ بِاَهْلِ الْقُبُوْرِ فِىْ غَيْرِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوْلَانْبِيَاءِ قَدْاَنْكَرَهُ كَثِيْرٌ مِّنَ الْفُقَهَاءِ وَاَثْبَتَهُ الْمَشَائِخُ الصُّوْفِيَّةُ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ قَالَ الْاِمَامُ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَبْرُ مُوْسٰى الْكَاظِمْ تِرْيَاقٌ مُّجَرَّبٌ لِاِجَابَةِ الدُّعَاءِ وَقَالَ الْاِمَامُ الْغَزَّالِىُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ مَنْ يُّسْتَمَدُّ بِهِ فِىْ حَيَاتِهِ يُسْتَمَدُّ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ۔

অর্থাৎঃ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কিংবা আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত অন্যান্য কবর বাসীদের (অলী) নিকট কোন বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা সম্পর্কে অনেক ফকিহ্‌গণই নিষেধ করেছেন; কিন্তু সুফী মাশায়িখ গণ এবং কোন কোন ফকিহ্‌গণ একে বৈধ ও বলেছেন। ফকিহ্ গণের মধ্যে ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বলেছেন যে, হযরত মুছা কাজেম (রাঃ)-এর মাজার শরীফ (বাগদাদ) দোয়া কবুলিয়তের জন্য এরূপ কার্যকর, যেমন জহর মোহরা সাপের বিষের জন্য পরীক্ষিত ও কার্যকর। সুফী সাধক উলামাদের মধ্যে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেছেনঃ জীবদ্দশায় যাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া যায়, মৃত্যুর পরও তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা যায়।" (মিশকাতের আরবী হাশিয়া জিয়ারাতুল কুবুরও আল-বাছায়ের, আল্লামা দাজুভী)

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, জাহেরী ফকিহ্গণের অনেকেই যদিও কবরবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা নাজায়েজ বলেছেন, কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) ও ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-এর মত আহলে বাতেন বা তাসাউফপন্থী উলামাগণ কবরবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাকে জায়েজ বলেছেন এবং পরীক্ষিত জহর মোহরা পাথরের ন্যায় কার্যকর বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ফতোয়া হিসেবে উক্ত দুজন ইমামের পরীক্ষিত বিষয়ই অগ্রগন্য হবে।

৩ নং দলীল ঃ ফতোয়া লক্ষৌভীতে ১৪১-১৪২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ

اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِى الْاُمُوْرِ فَاسْتَعِيْنُوْا بِاَهْلِ الْمَقَابِرِ - اَىْ اِذَا عَجَزْتُمْ فِىْ تَحْصِيْلِ مَقَاصِدِكُمْ فَاسْئَلُوا اللّٰهَ بِوَسِيْلَةِ اَصْحَابِ الْقُبُوْرِ لِتُقْبَلَ بِبَرَكَتِهِمْ دُعَاءُكُمْ -

অর্থ ঃ "যখনই তোমরা কোন পেরেশানীমূলক বিষয়ে পতিত হও, তখন কবরস্থ অলীগণের উছিলা দিয়ে খোদার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর। যেন তাদের বরকতে তোমাদের দুয়া কবুল হয়।

(মজমুউল ফাতোওয়া পৃষ্ঠা ১৪১-৪২)

৪নং দলীল ঃ মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবীর লিখিত ইমদাদুল ফতোয়া ৩য় খণ্ড আকায়েদ ও কালাম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে ঃ

جو استعانت واستمداد باعتقاد علم وقدرت مستقل ہو وہ شرك ہے اور جو باعتقاد علم وقدرت غير مستقل ہو اور وہ كسى دليل سے ثابت ہو جائے تو جائز ہے خواہ مستمد منہ زندہ ہو يا ميت -

অর্থ ঃ "অলীগণের জ্ঞান ও ক্ষমতাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে তাঁদের নিকট যে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তা শিরক। কিন্তু অলীগণের জ্ঞান ও ক্ষমতাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে না করে বরং আল্লাহ প্রদত্ত মনে করে যদি তাঁদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয় এবং যে কোন প্রমাণ ও উদাহরণ দ্বারা তাঁদের উক্ত সীমিত জ্ঞান ও ক্ষমতা প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েজ। চাই তিনি জীবিত হোন অথবা মৃত।"

পাঠকগণ লক্ষ্য করুন! অতি সাবধানে ও সতর্কতার সাথে মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, জীবিত অথবা ইনতিকালপ্রাপ্ত কোন অলীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েজ, তবে তাঁদের ঐ শক্তি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়া চাই এবং তাঁদের ক্ষমতাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে না করে বরং আল্লাহ প্রদত্ত মনে করা চাই। আল্লাহর মেহেরবাণীত মুসলমানগণ কখনও কোন অলীকে ক্ষমতায় ও জ্ঞানে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করে না। বরঞ্চ তাঁদের জ্ঞান ও ক্ষমতাকে আল্লাহ প্রদত্ত বলে বিশ্বাস করে এবং তাঁদেরকে উছিলা মনে করে। বেহেস্তী জেওরে তিনি অলিদের কাছে সাহায্য চাওয়াকে সরাসরি শিরক বলেছেন।

৫নং দলীল ঃ মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবী তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'নশরুত্তীব'-এর শেষাংশে পরিশিষ্টে কতিপয় আরবী কাসিদার উর্দ্দু তরজমা করেছেন। তম্মধ্যে একটি কাসিদার অনুবাদ নিম্নরূপঃ

دستگیری کیجئے میری نبی + کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی

"হে নবী (দঃ)! আপনি আমাকে সাহায্য করুন।" বিপদে আপদে আপনিই আমার সাহায্যকারী।"

এতে প্রমাণিত হলো যে, বালা মুসিবতের সময় হুজুর আকরাম (দঃ)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েজ।

৬ নং দলীল ঃ মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) রচিত "নুজহাতুল খাতিরিল ফাতির ফি তরজুমাতে সাইয়্যিদী আশ্-শরীফ আবদুল কাদির" নামক গ্রন্থে হুজুর গাউসে পাক (রাঃ)-এর মশহুর উক্তি বর্ণনা করেছেন। উক্তিটি নিম্নরূপ

مَنْ اِسْتَغَاثَ بِىْ فِىْ كُرْبَةٍ كُشِفَتْ عَنْهُ وَمَنْ نَادَانِىْ بِاِسْمِىْ فِىْ شِدَّةٍ فُرِجَتْ عَنْهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِىْ اِلَى اللّٰهِ فِىْ حَاجَةٍ قُضِيَتْ -

(بَهْجَةُ الْاَسْرَارِ)

অর্থাৎ ঃ বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) বলেন "যে ব্যক্তি চিন্তা ভাবনায় পড়ে আমার নিকট (রূহানী) সাহায্য প্রার্থনা করে, তার চিন্তা ও পেরেশানী দূর হবে। যে ব্যক্তি মুসিবতের সময় আমার নাম ধরে সাহায্য

প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আমাকে ডাকে, তার উক্ত মুসিবত দূরিভূত হবে এবং যে ব্যক্তি আমাকে উছিলা করে আল্লাহর নিকট কোন মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য দুয়া করে, তার উক্ত মনোবাসনা পূর্ণ হবে।" (বাহ্‌জাতুল আসরার) এখানে সাহায্য করার ক্ষমতা আল্লাহ প্রদত্ত ও সীমিত। আল্লাহর ক্ষমতা মৌলিক ও অসীম।

৭নং দলীল ঃ সাইয়্যিদ জামাল মক্কী (রহঃ)তদীয় ফতোয়া 'ফতোয়ায়ে জামালমক্কী' গ্রন্থে একটি প্রশ্নের উল্লেখ করে তাঁর জবাব দিয়েছেন নিম্নরূপেঃ

سُئِلْتُ عَمَّنْ يَقُوْلُ فِى الشَّدَائِدِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْ يَاشَيْخُ عَبْدَ الْقَادِرْ شَيْئًا لِلّٰهِ اَوْيَا عَلِىُّ هَلْ هُوَجَائِزٌ+ فَقُلْتُ نَعَمْ هُوَ اَمْرٌ مَشْرُوْعٌ وَشَئٌ مَّرْغُوْبٌ لَايُنْكِرُهُ اِلَّامُعَانِدٌ اَوْ مُتَكَبِّرٌ وَهُوَ مَحْرُوْمٌ عَنْ فُيُوْضِ الْاَوْلِيَاءِ وَبَرَكَاتِهِمْ-

অর্থাৎ "আমাকে (জামাল মক্কী) প্রশ্ন করা হলো, কোন ব্যক্তি বিপদে পড়ে যদি বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল! অথবা হে শেখ আবদুল কাদের! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য করুন। অথবা হে মাওলা আলী মদদ করুন"। তবে ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি? তদুত্তরে আমি বল্লাম, "এইরূপ সাহায্য প্রার্থনা করা শরীয়ত সম্মত ও খুবই উত্তম ব্যবস্থা। কোন হঠকারী বা অহঙ্কারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ এটাকে অস্বীকার করতে পারে না। যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, সে অলীগণের ফয়েজ ও বরকত থেকে অবশ্যই বঞ্চিত হবে।"

উপরোক্ত ৭টি দলীল দ্বারা আউলিয়ায়ে কেরাম বা নবী রাসূলগণের নিকট রুহানী সাহায্য চাওয়া, তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা উভয়ই শরীয়ত সম্মত ও বৈধ কাজ বলে প্রমাণিত হলো।

অষ্টম অধ্যায়

আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারে বা তাঁদের নামে মান্নত করা জায়েজ।

১নং দলীল ঃ

অলী-আল্লাহগণের নামে বা তাঁদের পবিত্র মাজারে উরস উপলক্ষে যে নজর বা মান্নত করা হয়, তার অর্থ নজরানা ও হাদিয়া। আর একটি শরয়ী নজর বা মান্নত আছে যা কেবল আল্লাহর জন্যই করা যায়। উহাকেই শরীয়তের পরিভাষায় শরয়ী নজর বলা হয়। ঐ প্রকারের মান্নতের উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান ও ইবাদত। কিন্তু অলীগণের উদ্দেশ্যে যে মান্নত করা হয়, উহা আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে উক্ত মান্নতের সাওয়াব ঐ অলীর রুহে পৌছানো এবং তাঁর দোয়া গ্রহণ করা।

যেমন কোন জীবিত বুজুর্গের খেদমতে কিছু নজরানা ও হাদিয়া মান্নত করা হয় তাঁর সম্মানের জন্য এবং তাঁর থেকে দোয়া গ্রহণ করার জন্য। অনুরূপ ভাবে মৃত্যুর পরও অলীগণের খেদমতে ইছালে সাওয়াবের নিয়তে এবং তাঁর দোয়া লাভের উদ্দেশ্যে কিছু মান্নত করা বৈধ ও জায়েজ। সুতরাং আল্লাহর নামের মান্নত ও আউলিয়ায়ে কেরামের নামের মান্নতের মধ্যে আকাশ জমিনের পার্থক্য বিদ্যমান। উভয়কে এক মনে করা মূর্খতা বৈ আর কিছুই নয়। উক্ত পার্থক্য হলোঃ আল্লাহর নামে যে মান্নত করা হয়, তা হচ্ছে নৈকট্য লাভও ইবাদতের উদ্দেশ্যে। আর অলীগণের নামে যে মান্নত করা হয়, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সাওয়াব পৌছানো। আর একটি পার্থক্য হচ্ছেঃ আল্লাহ্‌র নামের মান্নতের বস্তু ফকির মিসকিন ছাড়া ধনীরা খেতে পারবেনা। কিন্তু অলী আল্লাহগণের নামে মান্নতের বস্তু সকলেই খেতে পারবে। উদাহরণ স্বরূপঃ যদি কেহ মান্নত করে যে, আমার অসুখ ভাল হলে আমি হযরত শাহজালালের মাজারে অথবা আজমীর শরীফের খাজা বাবার দরগাহ্‌তে একটি গরু জবাই করবো, এই ছুরতে বলাও জায়েজ (হাদিকাতুন নাদিয়া দ্রষ্টব্য)। কেননা, এর অর্থ হচ্ছে-আমি আল্লাহর ওয়াস্তে একটি গরু অমুক অলীর মাজারে জবাই করবো, যার সওয়াব পৌছবে উক্ত অলীর রুহে; আর গোস্ত খাবে উপস্থিত সকলে। আরও একটি উদাহরণ দেয়া যাক। যেমন, কোন রোগী ডাক্তারকে বললো "আমার রোগ ভাল হলে আপনাকে পঞ্চাশ টাকা নজরানা দেয়া হবে।" উক্ত বাক্যের মধ্যে নজরানা শব্দটি মান্নত অর্থে আরবীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু হাদিয়া ও বখ্‌শিষ হিসাবে ও এই নজর

শব্দটি আরবীতে ব্যবহৃত হয়। (হাদিকাতুন নাদিয়া)। উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় 'নজরানা' ও 'নজর' শব্দ দুইটি হাদিয়া হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। হাদিয়া শুধু জায়েজই নয় বরং সৌজন্য ও ভদ্রতার পরিচায়কও বটে। কোন বুজুর্গ ব্যক্তি বা সম্মাণিত ব্যক্তির খেদমতে যাওয়ার সময় কিছু হাদিয়া নিয়ে যাওয়া সুন্নাত। আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফের সুরা মুজাদালার মধ্যে নবী করীম (দঃ)-এর দরবারে যাওয়ার জন্য প্রথম দিকে হাদিয়া নিয়ে যাওয়া ফরজ করে দিয়েছিলেন। পরে উক্ত আয়াতের ফরজ নির্দেশটি মান্‌সুখ বা রহিত করে সেটাকে মোস্তাহাব বা সৌজন্যমূলক হিসাবে নির্ধারিত করে দেন। এতেও প্রমানিত হলো যে, কোন বুজুর্গের (জীবিত মৃত) খেদমতে যাওয়ার সময় কিছু না কিছু হাদিয়া নিয়ে যাওয়া উত্তম। কেননা তাঁরা নবীজীর নায়েব। জীবিত হলে তিনি নিজে উহা ব্যবহার করবেন, অথবা বন্টন করবেন আর ইনতিকালপ্রাপ্ত হলে মাজারে উপস্থিত ব্যক্তিগণ তা ভোগ করবেন এবং উহার সাওয়াব মাজারস্থ অলীর রুহে পৌছ্‌বে। এইজন্যই বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ আছে—

بِاَنْ تَكُوْنَ صِيْغَةُ النَّذْرِ لِلّٰهِ تَعَالٰے لِلتَّقَرُّبِ اِلَيْهِ وَيَكُوْنُ ذِكْرُ الشَّيْخِ مُرَادًا بِهٖ فُقَرَاءُهٗ - (كِتَابُ الصَّوْمِ بَحَثُ اَمْوَاتٍ)

অর্থাৎ " নজর বা মান্নত শব্দটি আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু অলী-আল্লাহর নাম উল্লেখের অর্থ হবে মাজারে অবস্থানকারী ফকির ও মিসকিনগণ। "অর্থাৎ খাবে মিসকিনগণ; কিনতু সাওয়াব পাবেন মাজারস্থ অলী আল্লাহগন।

(কিতাবুস সওম বাহাছ আমওয়াত-ফতোয়া শামী)

২নং দলীল ঃ কবরস্থ কোন ব্যক্তি বা বুজুর্গের নামে কিছুর মান্নত করার প্রমান হাদীস শরীফেও পাওয়া যায়। যেমন— মদিনা শরীফের বাসিন্দা সাহাবী হযরত ছায়াদ ইবনে মুয়াজ (রাঃ) নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করলেন-ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মা ইনতিকাল করেছেন। আমি কোন্ জিনিস হাদিয়া বা মান্নত করলে আমার মায়ের রূহের আছানী হবে? নবী করীম (দঃ) এরশাদ করলেনঃ "একটি কুপ খনন করে জনসাধারনের জন্য দান করে দাও।" হযরত ছায়াদ (রাঃ) তাই-করলেন এবং বললেনঃ هذا لام سعد অর্থাৎ "এই কুয়াটি ছায়াদের মায়ের উদ্দেশ্যে দানকরা হলো। এতেই মৃত ব্যক্তির রূহে সাওয়াবের নিয়তে কিছু দান করার মান্নত করা জায়েজ বলে প্রমাণিত হলো। (মিশ্‌কাত) আরও বিস্তারিত দলীল অনুসন্ধান করুণ আমার লিখিত "ইছলাহি বেহেস্তি জেওর" "গ্রন্থে"

নবম অধ্যায়

জিয়ারত ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে মহিলাদের মাজারে গমন করা জায়েজ।

দলীল ও প্রমাণঃ

১ নং দলীল ঃ মিশ্‌কাত শরীফ জিয়ারাতুল কুবুর অধ্যায়ে একটি হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ الاَفَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ (مُسْلِمْ)

অর্থাৎ- "ইসলামের প্রাথমিক যুগে আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে (বিশেষ কারণে) নিষেধ করতাম। কিন্তু এখন তোমরা কবর জিয়ারত করো। কেননা, একাজ পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"

উক্ত হাদীসে কবর জিয়ারতের পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞা রহিত করে কবর জিয়ারতের অনুমতি নূতন করে প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং হাদীস শরীফের প্রথম অংশ হচ্ছে নিষেধাজ্ঞামূলক এবং দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সূচক। প্রথম অংশে জিয়ারত নিষেধ করন্ এবং শেষাংশে জিয়ারতের অনুমতি প্রদান। আরবীতে প্রথম অংশ অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা অংশকে বলা হয় মানছুখ। দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় নাছেখ বা রদকারী। এমতাবস্থায় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের উপরই অর্থাৎ কবর জিয়ারতের অনুমতির উপরই কিয়ামত পর্য্যন্ত আমল করতে হবে। এতে কেউ বাধা দিতে পারবেনা। উক্ত হাদীসে যে কোন স্থানে গিয়ে কবর জিয়ারত করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। যেমন আজমীর শরীফ, বাগদাদ শরীফ, সিলেট, পাকিস্তানের দাতা গঞ্জেবখ্‌শ সাহেবের মাজার ইত্যাদি-সর্বত্রই যাওয়ার অনুমতি সহ জিয়ারত করার বিধান দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু উপরোক্ত হাদীসের মর্মানুযায়ী নারী-পুরুষ সকলের জন্যই কবর জিয়ারতের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। হাদীসে 'কুম' (كُمْ) সর্বনামটি নারী পুরুষ সকলের জন্য প্রযোজ্য আইনী)

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, অন্য একটি হাদীসে জিয়ারত কারিনী মহিলাদের উপর নবী করীম (দঃ) লানতের কথা বলেছেন। সুতরাং কবর জিয়ারতের অনুমতি কেবল পুরুষদের বেলায় প্রযোজ্য এবং মহিলাদের বেলায় নাজায়েজ। উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রথম হলো-যদি মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারত নিষিদ্ধই হতো এবং লানতের কারণ হতো, তাহলে নবী করীম (দঃ)-এর ইনতিকালের পরে কি করে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা(রাঃ) সুদুর মদিনা মুনাওয়ারা হতে ৫০০ কিলোমিটার রাস্তা সফর করে মক্কা মুয়াজ্জামায় এসে তাঁর ভাই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ)-এর কবর জিয়ারত করতেন? এবং হযরত ফাতিমা জাহরা (রাঃ) কি করে প্রতি শুক্রবারে মদিনা শরীফ থেকে তিনমাইল দূরে ওহুদের ময়দানে গিয়ে হযরত আমীর হামজা (রাঃ)-এর মাজার জিয়ারত করতেন? এতেই প্রমাণিত হয় যে, লানত সকল মহিলাদের ক্ষেত্রে নহে বরং যারা শরীয়তের বহির্ভূত-বেপর্দায় ও বেগানা পুরুষের সাথে জিয়ারত করতে যাবে অথবা কবরে গিয়ে শরীয়ত বিরোধী মাতম করবে, অথবা সেখানে ইজ্জত আবরু নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে, কেবল তাদের বেলায়ই লা'নত। এমতাবস্থায়ই নারীদের জন্য নাজায়েজ হবে এবং লানতের কারণ হবে। ইহাই হাদীস বিশারদগনের ব্যাখ্যা। এভাবেই উভয় হাদীসের উপর আমল করা সম্ভব। (আল বাছায়েরও গাউসুলইবাদ)

দ্বিতীয় দলিল ঃ 'সিরাজুল ওহহাজ নামক ফেকাহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ لِلْاِعْتِبَارِ وَالتَّرَحُّمِ وَالتَّبَرُّكِ بِزِيَارَةِ الصَّالِحِيْنَ مِنْ غَيْرِ مَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ فَلَا بَأْسَ بِهٖ اِذَا كُنَّ عَجَائِزَ وَكُرِهَ لِلشَّابَّاتِ كَحُضُوْرِهِنَّ فِى الْمَسَاجِدِ لِلْجَمَاعَاتِ الْخَمْسَةِ - وَحَاصِلُهٗ اَنَّ مَحَلَّ الرُّخْصَةِ لَهُنَّ اِذَا كَانَتِ الزِّيَارَةُ عَلٰى وَجْهٍ لَيْسَ فِيْهِ فِتْنَةٌ - وَالْاَصَحُّ اَنَّ الرُّخْصَةَ ثَابِتَةٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِاَنَّ سَيِّدَةَ النِّسَاءِ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَزُوْرُ قَبْرَ حَمْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ

جُمُعَةٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَزُوْرُ قَبْرَ اَخِيْهَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِمَكَّةَ ذَكَرَهُ بَدْرُ الدِّيْنِ الْعَيْنِىُّ فِىْ شَرْحِ الْبُخَارِىِّ -

অর্থাৎ "সিরাজুল ওহ্‌হাজ গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ বুজুর্গানে দ্বীনের মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে বরকত লাভ করা, কবরবাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন, কিংবা কবর জিয়ারতের মাধ্যমে পরকালের জীবনের বিষয়ে উপদেশ গ্রহন করনার্থে গমন এবং শরীয়ত পরিপন্থী কিছু না করার শর্তে বৃদ্ধ মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারতে গমন করা জায়েজ। যুবতী মহিলাদের ক্ষেত্রেও জায়েজ, তবে মাকরুহ। যেমন— পাঞ্জেগানা নামাজের জামাতে মসজিদে গমনের বেলায় বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে বিনা মাকরুতেই জায়েজ। কিন্তু যুবতীদের বেলায় মাকরুহ। মূল কথা হলোঃ কোন প্রকার ফিতনার আশংকা না থাকলে মহিলাদের জন্যও কবর জিয়ারতে গমন করা বৈধ। অধিক সহি রেওয়ায়েত অনুযায়ী পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই কবর জিয়ারতে গমন করা সাধারণভাবে বৈধ। প্রমানস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহিলাকুল শিরোমনি হযরত ফাতিমা (রাঃ) প্রতি জুমার দিনে হযরত আমির হামজার (রাঃ) মাজার শরীফ জিয়ারত করতে যেতেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) মক্কায় অবস্থিত তাঁর ভাই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ)-এর কবর জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে গমন করতেন। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) শরহে বুখারী গ্রন্থে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।" (সিরাজুল ও হওহাজ)

বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলেই কেবল নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যেতে পারে। সাধারণভাবে মহিলাদের জিয়ারতের ক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

উল্লেখ্য যে, হানাফী মাজহাবের সবচেয়ে বিজ্ঞ হাদীসবেত্তা ও হাদীস বিশারদ ইমাম আল্লামা আইনী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যার উপর আর কোন ব্যাখ্যা হতে পারে না। আলহামদু লিল্লাহ! উক্ত ফায়সালা অনুযায়ীই যুগ যুগান্তর হতে মহিলাগণ সন্তানাদির জন্য দোয়াও বরকত লাভের জন্য এবং পরকাল স্মরন করার উদ্দেশ্যে মাজার সমূহে জিয়ারতের জন্য গমন করে থাকেন। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে। নিয়ত পরিমাণেই বরকত হয়। যুগ যুগ ধরে এর উপরই আমল করা হচ্ছে এবং এই প্রথা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে ইন্‌শা আল্লাহ। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞাতা। মহিলাদের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধি বিধান মেনেই জিয়ারতে যেতে হবে। শরীয়ত ভঙ্গ করে অন্য কোথাও যাওয়ার অনুমতিও নেই।

দশম অধ্যায়

মাজার জিয়ারতের নিয়মঃ মাজার মুখী হয়ে মুনাজাত করা ও অলীগণের উছিলা ধরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা জায়েজ ও সুন্নাত। বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্ন ও জবাব।

প্রত্যেক কাজের একটি নিয়ম পদ্ধতি আছে। রীতিনীতি ব্যতিত কোন কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দর হয় না। আরবীতে এই নিয়ম ও রীতিনীকে আদব বলা হয়। যেমন হাদীস শরীফের কিতাব সমূহে কিতাবুল আদাব' নামে একটি পৃথক পরিচ্ছেদ রয়েছে। মেশকাত শরীফে "কিতাবুল আদাব" নামে ৩৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি বিরাট পরিচ্ছেদ আছে। এ পরিচ্ছেদের অধীনে কতগুলো "বাব" বা অধ্যায় রয়েছে। যেমন বাবুছ ছালাম, বাবুল কিয়াম, বাবুল মুছাফাহা ওয়াল মুয়ানাকা ইত্যাদি। মিশকাত শরীফের এই পরিচ্ছেদ ও অধ্যায়গুলো বর্তমানে বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে দাখিল পরীক্ষার জন্য (১০ম শ্রেনী) পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে মেশকাত শরীফে "কিতাবুল যানায়েজ অধীনে "বাবুজ জিয়ারাত" নামে অন্য একটি অধ্যায় রয়েছে। অত্র কিতাবের ৮নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নবী করিম (দঃ)-এর রওজা মোবারকের জিয়ারত এবং জিয়ারত পদ্ধতি ও জিয়ারতের অনুমোদন সংক্রান্ত যেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, তার সবগুলোই মেশকাত শরীফ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের "বাবুজ জিয়ারাত" অধ্যায় হতে সংগ্রহ করেছি। মাজার জিয়ারতের নিয়ম পদ্ধতি আলোচনা করতে হলে সর্ব প্রথম আলোচনা করতে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর (দঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ রওজা মোবারকের জিয়ারতের আদব ও নিয়মপদ্ধতি সম্পর্কে। সাথে সাথেই আলোচনা করতে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর রওজা মোবারক দ্বয়ের জিয়ারতের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কেও। তারপর আলোচনায় আসতে হবে ক্রমান্বয়ে জান্নাতুল বাকী ওহোদ ময়দানের শহীদানদের মাজার জিয়ারতের বিষয়ে। এরপর হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) ও শহীদানে কারবালার মাজার সমূহ জিয়ারতের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে। কেননা, ঐ যুগটি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের যুগ। সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে নবী করিম (দঃ), হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত ওমর ফারুক, হযরত আমির হামজা ও ওহোদের অন্যান্য শহীদানগণ, জান্নাতুল বাকীতে

শায়িত মা হালিমা, খাতুনে জান্নাত মা ফাতিমা জাহ্‌রা ও অন্যান্য সাহাবাগণের (রিদওয়ানুল্লাহে তায়ালা আলাইহিম আজমাইন) মাজার সমূহ জিয়ারত করতেন তার কিছু নমুনা প্রথমে জানতে হবে। অদ্যাবধি মুসলমান হাজীগণ কোন্ পদ্ধতিতে উক্ত রওজা মোবারক ও মাজার সমূহ জিয়ারত করে আসছেন, সে বিষয়ে "হজ্জ ও জিয়ারত" নামক গ্রন্থ সমূহে বিস্তারিত নিয়ম পদ্ধতি লেখা আছে। এরপরই অন্যান্য আউলিয়ায়ে কেরাম গণের মাজার সমূহ জিয়ারতের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা সহজ হবে। কেননা, ইনিরা হচ্ছেন পূর্ববর্তীগণের উওরসুরী। একই ধারা এবং একই নিয়ম পদ্ধতি সকলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

এখন আমি প্রথমে নবী করিম (দঃ) এবং প্রধান দুই সাহাবীর রওজা মোবরক জিয়ারতের বিষয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করবো-ইন্‌শা আল্লাহ।

নবী করীম (দঃ)-এর রওজা মুবারক জিয়ারতের নিয়ম

বিখ্যাত ফতোয়াগ্রন্থ "আলমগীরিতে" ও অন্যান্য কিতাব সমূহে উল্লেখ আছেঃ মদিনা মুনাওয়ারাতে গিয়ে প্রথমে অজু গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে "বাবুছ ছালাম" দিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে প্রথমে দু রা'কাত নফল নামাজ আদায় করবে। তারপর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে নামাজের মত হাত বেধে নবী করিম (দঃ)-এর চেহারা মোবারক বরাবর মুখোমুখী হয়ে কেবলাকে পিছনে রেখে দাঁড়াবে এবং এভাবে দরূদ ও ছালাম পেশ করবেঃ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ + اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَانَبِيَّ اللّٰهِ + اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللّٰهِ + اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلَيْكَ يَانُوْرَعَرْشِ اللّٰهِ + اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ +
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ + اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَارَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ + وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ حَقِّكَ الْعَظِيْمِ وَلَوْ اَنَّهُمْ
اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا
اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۔ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ جِئْتُكَ هَارِبًا مِّنْ ذُنُوْبٍ عَمِلْتُ

وَمُسْتَشْفِعًا بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فَاشْفَعْ لِىْ يَا شَفِيْعَ الْاُمَّةِ يَاكَاشِفَ الْغُمَّةِ يَا سِرَاجَ الظُّلْمَةِ + اَجِرْنِىْ بِهٖ يَا اَللّٰهُ مِنَ النَّارِ ـ يَا نَبِىَّ الرَّحْمَةِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ اَتَيْنَاكَ زَائِرِيْنَ ـ وَقَصَدْنَاكَ رَاغِبِيْنَ ـ وَعَلٰى بَابِكَ الْعَالِىْ وَاقِفِيْنَ ـ وَبِحَقِّكَ عَارِفِيْنَ ـ فَلَا تَرُدَّنَا خَائِبِيْنَ ـ وَلَا عَنْ بَابِكَ مَحْرُوْمِيْنَ ـ يَا سَيِّدِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْاَلُكَ الشَّفَاعَةَ ـ وَاَسْاَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى لَكَ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ وَالْحَوْضَ الْمَوْرُوْدَ وَالشَّفَاعَةَ الْعُظْمٰى فِى الْيَوْمِ الْمَشْهُوْدِ ـ اَشْهَدُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ ـ وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ ـ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ ـ وَجَلَبْتَ الظُّلْمَةَ ـ وَجَاهَدْتَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ـ وَعَبَدْتَ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ جَزَاكَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنَّا وَعَنْ وَالِدَيْنَا وَعَنِ الْاِسْلَامِ خَيْرَ الْجَزَاءِ ـ وَنَسْاَلُكَ الشَّفَاعَةَ اَنْ تَشْفَعَ لَنَا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْعَرْضِ ـ وَيَوْمَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ ـ يَوْمَ لَايَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ـ اِشْفَعْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيْعِ اِخْوَانِنَا وَلِمَشَائِخِنَا وَلِاُسْتَاذِنَا وَلِمَنْ اَوْصَانَا ـ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

(اَلْمُخْتَصَرْ)

বাংলা উচ্চারণঃ আস্‌সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ! আস্‌সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! আস্ সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ! আস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা ইয়া নূরা আরশিল্লাহ। আস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা ইয়া খাইরা খাল্‌কিল্লাহ! আস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা ইয়া শাফীয়াল মুজনিবীন। আস্‌সালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা ইয়া রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন! ওয়া ক্বাদ্ ক্বাল্লাল্লাহু তায়ালা ফি হাক্বিক্বিকাল আজীমঃ ওয়া লাও আন্নাহুম ইজ্ জালামু আন্‌ফুছাহুম জা-উকা ফাছ্‌তাগ্ ফারুল্লাহা ওয়াছ তাগ্‌ফারা লাহুমুর রাছুলু; লাওয়াজাদুল্লাহা তাওয়্যাবার রাহীমা"। "ইয়া রাসুলাল্লাহ! ক্বাদ্ জি'তুকা হা-রিবান মিন জাম্‌বী, ওয়া মিন আমালী, ওয়া মুছ্‌তাশ্‌ফিয়াম বিকা ইলা

রাব্বী, ফাশ্‌ফি' লী ইয়া শাফীয়াল উম্মাহ্! ইয়া কাশিফাল গুম্মাহ! ইয়া ছিরাজাজ জুল্‌মাহ! আজির্‌নী বিহী ইয়া আল্লাহু মিনান নার্।" "ইয়া নাবিয়্যার রাহ্‌মাতি ইয়া রাসুলাল্লাহ! আতাইনাকা জাঈরীন; ওয়া ক্বাছাদ্‌নাকা রাগিবীন; ওয়া আলা বাবিকাল আ'লী ওয়াক্বিফীন; ওয়া বিহাক্বিক্বিকা আরিফীন; ফালা তারুদ্দুনা খাঈবীন; ওয়ালা আন্ বাবিকা মাহ্‌রুমীন!" "ইয়া ছাইয়্যিদী ইয়া রাসূলাল্লাহ! আছ্-আলুকাশ শাফাআতা ওয়া আছ-আলুল্লাহা তায়ালা লাকাল ওয়াছিলাতা, ওয়াল ফাদীলাতা, ওয়াদ দারাজাতার রাফীআতা, ওয়াল মাক্বামাল মাহ্‌মূদা, ওয়াল হাওজাল মাওরুদা, ওয়াশ্ শাফাআতাল্ উজ্‌মা ফিল ইয়াও মিল মাশ্‌হুদ্।" "আশ্‌হাদু ইয়া রাসুলাল্লাহ! ক্বাদ বাল্লাগ্‌তার রিছালাতা, ওয়া আদ্দাইতাল্ আমানাতা, ওয়া নাছাহ্‌তাল উম্মাতা, ওয়া কাশাফ্‌তাল গুম্মাতা, ওয়া জালাব্‌তাজ জুল্‌মাতা, ওয়া জাহাত্তা ফী ছাবীলিল্লাহি হাক্বা জিহাদিহী, ওয়া আবাত্তা রাব্বাকা হাত্তা ইয়া তিয়াকাল ইয়াক্বীন। যাজাকাল্লাহু তায়ালা আন্না ওয়া আন্ ওয়ালিদাইনা ওয়া আনিল ইছলামি খাইরাল যাজায়ে। ওয়া নাছআলুকাশ শাফায়াতা আন্ তাশ্‌ফায়া লানা ইন্‌দাল্লাহি ইয়াওমাল আরজি, ওয়া ইয়াওমাল ফাজাইল আকবারি, ইয়াওমা লা-ইয়ান্‌ফাউ মা-লুউ ওয়ালা বানুনু; ইল্লা মান্ আতাল্লাহা বিক্বালবিন ছালীমিন। ইশ্‌ফি' লানা, ওয়ালি ওয়ালিদাইনা, ওয়ালি জীরানিনা, ওয়ালি মাশায়িখিনা, ওয়ালি উছতাজিনা, ওয়ালি মান আওছানা। আস্ সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া ছাইয়্যিদিল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মুরছালীন! ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!" (সংক্ষিপ্ত)

অর্থঃ দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি-হে আল্লাহর প্রিয় রাসুল! দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি-হে আল্লাহর প্রিয় হাবীব! দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি- হে আল্লাহর আরশের নূর! দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি-হে আল্লাহর সৃষ্টির সেরা! দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি-হে গুনাহ্‌গারের শাফাআতকারী! দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি- হে বিশ্বজগতের রহমত!

মহান আল্লাহ্ তায়ালা আপনার মহান শান সম্পর্কে কুরআন মজিদে এরশাদ করেছেনঃ "এবং তারা (গুনাহ্‌গারগণ) যখনই নিজেদের উপর জুলুম করে যদি আপনার মহান স্বত্তার নিকট আসে এবং খোদার নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করে; আর রাসুলও যদি তাদের জন্য সুপারিশ করেন, তাহলে তারা আল্লাহকে পাবে মহা তওবা কবুলকারী ও দয়ালু হিসাবে।"

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার গুনাহ্ ও মন্দ কর্ম হতে পলায়ন করে আপনার মহান দরবারে এসেছি এবং আমার প্রতিপালকের দরবারে আপনার সুপারিশের বড় আশা নিয়ে এসেছি। অতএব, আপনি সুপারিশ করুন আমার জন্য—হে উম্মতের সুপারিশকারী! হে অন্ধকার দূরীভূত কারী! হে অন্ধকারের প্রদীপ! " হে আল্লাহ! তাঁর উছিলায় তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও।" "হে রহমতের নবী! হে মহান রাসূল! আমরা আপনার মহান দরবারে এসেছি—আপনার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে। আমরা অধীর আগ্রহ নিয়ে আপনার উদ্দেশ্যেই এসেছি এবং আপনার মহান দরজায় দন্ডায়মান হয়েছি। আপনার মহান মর্যাদা সম্পর্কেও আমরা অগত রয়েছি। অতএব, আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং আপনার শাফায়াতের দরজা থেকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দেবেন না। হে আমার মনিব, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করি। আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট আপনার জন্যও প্রার্থনা করছি- মধ্যস্থতা, বুজর্গী, উন্নত পদমর্যাদা, প্রশংসিত স্থান, জান্নাতীদের অবতরণ স্থল-হাউজে কাউছার, এবং কেয়ামত দিবসে বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম শাফায়াত (প্রদানের জন্য)।"

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেছেন। আমানত যথাযথভাবে আদায় করেছেন। উম্মতকে উপদেশ দিয়েছেন। অন্ধকার দূরীভূত করেছেন। অন্ধকারকে আলোর দ্বারা পরিবর্তন করেছেন। আল্লাহর পথে যথাযথভাবে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন (দুশমনদের বিরুদ্ধে)। আর আপনার নিকট নিশ্চিত বস্তু (ওফাত) আসা পর্যন্ত আপনি আপন প্রতিপালকের ইবাদত করে গেছেন।" আল্লাহ আপনাকে আমাদের পক্ষ হতে, আমাদের পিতা মাতার পক্ষ হতে এবং সমগ্র ইসলামী বিশ্বের পক্ষ হতে, উত্তম প্রতিদান মঞ্জুর করুন। আর আমরা আপনার মহান দরবারে শাফায়াত প্রার্থনা করছি, যেন আপনি মহা আতংকের 'কিয়ামত' দিবসে আমাদের জন্য দয়া করে সুপারিশ করেন। সে দিন ধনবল ও জনবল বা মাল দৌলত-সন্তানাদি। (স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে) কোন উপকারে আসবে না। শুধু উপকারে আসবে যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে হাজির হবে। হে রাসূল (দঃ)! সুপারিশ করুন আমাদের জন্য। আমাদের পিতা-মাতার জন্য। আমাদের প্রতিবেশীদের জন্য। আমাদের পীর

মাশায়িখদের জন্য। আমাদের ওস্তাদগণের জন্য এবং যারা আমাদেরকে অনুরোধ করেছেন (ভালকাজ করার ও ছালাম পৌছানোর জন্য) দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি, হে নবী ও রাসূলগণের সরদার! আল্লাহর রহমত ও বরকত আপনার উপর বর্ষিত হোক" (সংক্ষিপ্ত)।

পর্যালোচনা ঃ

উপরোক্ত জিয়ারতের নিয়ম-পদ্ধতি ও দোয়া-মুনাজাতের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি আক্বিদা প্রমাণিত হয়েছে। যথা—

(১) নবী করিম (দঃ) কে ইনতিকালের পরেও 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলে সরাসরি সম্বোধন করা জায়েজ।

(২) নবী করিম (দঃ) উক্ত দরূদ ও সালাম শুনেন। তিনি স্বশরীরে জিবীত ও হায়াতুন্নবী। মাটি নবীগণের পশম পর্যন্তও নষ্ট করতে পারে না। (তাবরানী)।

(৩) বান্দা আল্লাহর কাছে যে কোন অপরাধ বা গুনাহ্ করে যদি নবী করিম (দঃ)-এর রওজা মোবারকে গিয়ে হাজির হয় এবং তাঁকে মাধ্যম বানিয়ে খোদার কাছে ক্ষমা চায়, তাহলে খোদা তায়ালা ঐ বান্দার গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং তাকে রহম করেন। মদিনা যেতে অক্ষম ব্যক্তিরা শুধু নবী করিম (দঃ) কে মনের মধ্যে ধ্যান করে তাঁকে উছিলা করে গুনাহ ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাকেও ক্ষমা করে দেবেন। (তাফসীরে নাঈমী ও শানে হাবীব)

৪। নবী করিম (দঃ)-কে সম্বোধন করে সরাসরি তাঁর দরবারে আবেদন নিবেদন করাও জায়েজ। যেমন করা হয়েছে উক্ত দোয়ায়।

৫। নবী করিম (দঃ) উম্মতের মকসুদ পূর্ণ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। যেমনঃ "হে রাসূল! আমাদেরকে বঞ্চিত ও নিরাশ করে দেবেন না"-এই আবেদনের মধ্যে উক্ত মস্‌য়ালাটি প্রমানিত হয়েছে।

৬। শাফায়াতের জন্য সরাসরি নবী করিম (দঃ)-এর কাছে প্রার্থনা করা জায়েজ। যেমনঃ "আছ আলুকা" আমি আপনার কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করছি-এই বাক্যের দ্বারা প্রমানিত।

৭। মাজারে দাঁড়িয়ে নামাজের মত হাত বেঁধে ছালাম আরজ করা উত্তম ও আদব।' (আলমগীরি)

৮। একই দুয়ায় বা মুনাজাতের মধ্যে একবার আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং একবার নবী করিম (দঃ)-এর কাছে কিছু প্রার্থনা করা যায়েজ। যেমনঃ- "আজিরনী বিহি ইয়া আল্লাহ্ মিনান নার" এবং "নাছ্আলুকাশ শাফায়াতা"-এই বাক্যের মধ্যে প্রথমটি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এবং দ্বিতীয়টি নবী করিম (দঃ)- এর নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে নবী করিম (দঃ)-এর উওরসুরী অলি আল্লাহ গণের নিকটও রূহানী সাহায্য প্রার্থনা করা এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা একই মুনাজাতে যায়েজ ও বৈধ (ফতোয়ায়ে আজিজি শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী)।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর মাজার জিয়ারতের নিয়ম ঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর মাজার শরীফ নবী করিম (দঃ)—এর রওজা মোবারকের সাথে একই কামরায় বা হুজরা মোবারকে অবস্থিত। নবী করিম (দঃ)-এর বাম হাতে সিনা বরাবর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর মাথা মোবারক। উভয় রওজা মা আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর হুজরা মোবারকের ভিতর-যা বর্তমানে মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে অন্তর্ভূক্ত। দেওয়াল ও জালী মোবারক দ্বারা ঘেরাও করা। নবী করিম (দঃ)-এর জিয়ারত শেষ করে একটু ডান দিকে সরে গিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দরূদ ও সালাম পেশ করতে হবে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا اَبَا بَكْرِنِ الصِّدِّيْقَ + اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَى التَّحْقِيْقِ + اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ + اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامَنْ اَنْفَقَ مَالَهٗ كُلَّهٗ فِىْ حُبِّ اللّٰهِ وَحُبِّ رَسُوْلِهٖ حَتّٰى تَخَلَّلَ بِالْعَبَا رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْكَ وَاَرْضَاكَ اَحْسَنَ الرِّضَا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكَ وَمَسْكَنَكَ وَمَحَلَّكَ وَمَأْوٰكَ + اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَوَّلَ الْخُلَفَاءِ وَتَاجَ الْعُلَمَاءِ وَصِهْرَ النَّبِىِّ الْمُصْطَفٰى وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

বাংলায় উচ্চারণ ঃ "আস্লালামু আলাইকা ইয়া ছাইয়্যিদানা" আবা বাক্রিনিস্ সিদ্দীক! আস্ সালামু আলাইকা ইয়া খালীফাতা রাছুলিল্লাহি আলাত্ তাহ্কীক্! আস্ সালামু আলাইকা ইয়া ছাহিবা রাছুলিল্লাহি ছানিয়াস্ নাইনে ইজ্ হুমা ফিল গার। আস্ সালামু আলাইকা ইয়া মান আন্ফাকা মা-লাহু কুল্লাহু ফি হুব্বিল্লাহি ওয়া হুব্বি রাছুলিহি হাত্তা তাখাল্লালা বিল্ আবা; রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্কা ওয়া আরদাকা আহ্ছানার রিদা; ওয়া জাআলাল জান্নাতা মান্জিলাকা ওয়া মাছ্কানাকা ওয়া মাহাল্লাকা ওয়া মা'ওয়াকা। আস সালামু আলাইকা ইয়া আউয়ালাল খোলাফায়ে ওয়া তা-জাল উলামায়ে ওয়া ছিহ্রান্ নাবিয়্যীল মুস্তাফা; ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।"

অর্থঃ "ছালাম আপনার প্রতি-হে আমাদের সরদার আবু বকর সিদ্দীক-(রাঃ)! ছালাম আপনার প্রতি-হে আল্লাহর রাসুলের প্রকৃত প্রথম খলিফা। ছালাম আপনার প্রতি-হে আল্লাহর রাসূলের সাথী এবং "দুয়ের মধ্যে দ্বিতীয়-যখন তাঁরা (সাওর) গুহার মধ্যে ছিলেন, ছালাম আপনার প্রতি-হে মহান পুরুষ-যিনি আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসুলের মুহাব্বাতে নিজের যাবতীয় মাল-দৌলত ব্যয় করে ফেলেছেন এবং আপন গায়ের জামা পর্যন্ত খুলে দান করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং আপনাকেও সন্তুষ্ট রাখুন উত্তম সন্তুষ্টদানে। তিনি জান্নাতকে আপনার ঘর, আবাসস্থল ও আশ্রয়স্থল করে দিন! ছালাম আপনার প্রতি-হে সর্ব প্রথম খলিফা! ওলামাগণের মাথার মুকুট! নবী মুস্তাফা (দঃ)-এর শ্বশুর! আর আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।"

"হযরত ওমরের (রাঃ) মাজার জিয়ারতের নিয়ম"

হযরত ওমর (রাঃ)-এর মাজার হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বাম হাতে তাঁর সিনা বরাবর। জিয়ারতকারী একটু ডান হাতে সরে গিয়ে হযরত ওমর (রাঃ) এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিম্নরূপে সালাম আরজ করবে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ + اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَاطِقًا بِالْعَدْلِ وَالصَّوَابِ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُزَيِّنَ الْمِنْبَرِ وَالْمِحْرَابِ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُظْهِرَ دِيْنِ الْاِسْلَامِ + اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُكَسِّرَ الْاَصْنَامِ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْفُقَرَاءِ وَالضُّعَفَاءِ وَالْاَرَامِلِ وَالْاَيْتَامِ ـ اَنْتَ الَّذِىْ قَالَ فِىْ حَقِّكَ سَيِّدُ الْبَشَرِ لَوْ كَانَ نَبِىٌّ مِّنْ بَعْدِىْ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ

الْخَطَّاب ۔ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْكَ وَاَرْضَاكَ اَحْسَنَ الرِّضَا ۔ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكَ وَمَسْكَنَكَ وَمَحَلَّكَ وَمَاْوَاكَ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَانِيَ الْخُلَفَاءِ وَصِهْرَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفٰى * وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ۔

বাংলায় উচ্চারণ ঃ আস্ সালামু আলাইকা ইয়া ওমারবনাল্ খাত্তাব। আস্ সালামু আলাইকা ইয়া নাতিকাম্ বিল্ আদ্লি ওয়াছ ছাওয়াব। আস্ সালামু আলাইকা ইয়া মুজায়্যিনাল মিম্বারি ওয়াল মিহরাব। আস্ সালামু আলাইকা ইয়া মুজহিরা দ্বীনিল ইছলাম। আস্ সালামু আলাইকা ইয়া মুকাচ্ছিরাল আছ্নাম। আস সালামু আলাইকা ইয়া আবাল ফুক্বারা ওয়াদ্ দোয়াফা-ই-ওয়াল আরামিলে ওয়াল আয়তাম। আন্তাল্লাজী ক্বালা ফি হাক্বিকা ছাইয়্যিদুল বাশারিঃ "লাও কানা নাবিয়্যুন মিম বা'দী, লাকানা ওমরাবনাল খাত্তাব।" রাদিয়াল্লাহু আন্কা ওয়া আরদাকা আহ্ছানার রিদা। ওয়া জাআলাল জান্নাতা মান্জিলাকা ওয়া মাছ্কানাকা ও মাহাল্লাকা ওয়া মা'ওয়াকা। আস্ সালামু আলাইকা ইয়া ছানিয়াল খোলাফায়ে ওয়া ছিহ্রান নাবিয়্যিল মুস্তাফা। ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু"।

অর্থঃ "সালাম আপনার প্রতি-হে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)।

সালাম আপনার প্রতি-হে মিম্বার ও মেহ্রাবের শোভা বৃদ্ধিকারী।

সালাম আপনার প্রতি-হে দ্বীন ইসলামের বিজয় সাধনকারী।

সালাম আপনার প্রতি-হে মূর্তি ধ্বংসকারী।

সালাম আপনার প্রতি-হে ফকির, দুর্বল, বিধবা ও ইয়াতীমগণের সাহায্যকারী। আপনি এমন ব্যক্তিত্ব, যার মর্যাদা সর্ম্পকে মানবজাতির সরদার মোহাম্মদ (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ "আমার পর যদি কোন নবী হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো, তাহলে নিশ্চয়ই সে হতো ওমর ইবনুল খাত্তাব"। আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং আপনাকেও উত্তমরূপে সন্তুষ্ট রাখুন। আর জান্নাতকে আপনার ঘর, বাসস্থান, আবাসস্থল ও আশ্রয়স্থল হিসাবে পরিনত করুন। হে দ্বিতীয় খলিফা; উলামাগণের মাথার মুকুট ও নবী মুস্তাফা (দঃ)-এর শ্বশুর! আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।"

উভয় খলিফার মাজার জিয়ারতকালে উপরোক্ত সালাম পদ্ধতির মধ্যে নিম্নের কয়েকটি আক্বিদা প্রমানিত হলো। যথাঃ

(১) উক্ত দুজন খলিফা, অলীগণেরও অলী। তাঁদের মাজার জিয়ারতকালে দাঁড়িয়ে আদবের সাথে এবং ভক্তি সহকারে সালাম পেশ করতে হবে।

(২) তাঁদেরকে সম্বোধন করে তাঁদের গুণগান বর্ণনা করা সুন্নাত। অলীগণের প্রকৃত সানা সিফাত বর্ণনা করা উত্তম। অলীগন সালাম শুনেন এবং জিয়ারত কারীকে দেখেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর রওজা মোবারক জিয়ারতকালে হযরত ওমর (রাঃ) মাজার থেকে তাঁর দিকে চেয়েছিলেন বলে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) নিজে বর্ণনা করেছেন। বুখারী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে মাওলানা হামদুল্লাহ্ দাজুভী সাহারানপূরী তাঁর প্রসিদ্ধ আরবী কিতাব 'আল বাছায়ের' গ্রন্থে একথা উল্লেখ করেছেন। এরপর থেকে হযরত আয়েশা (রাঃ) বোরকা পরিধান করেই রওজা মোবারকে ঢুকতেন।

কবরস্থ অলী-আল্লাহ্গণ জিয়ারত কারীকে দেখেন এবং চিনেন। মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবী দেওবন্দীও একথা স্বীকার করেছেন। তার লিখিত 'বজ্‌মে জাম্‌শীদ' গ্রন্থে তিনি শাহ আবদুর রহিম দেহলভী (রহঃ)এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। একদিন শাহ আবদুর রহিম (শাহ ওয়ালি উল্লাহর পিতা) দিল্লীর কুতুবুদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রহঃ)-এর মাজার শরীফ জিয়ারত করতে যান। হঠাৎ তাঁর মনে খেয়াল হলো-কুতুব সাহেব কি তাঁকে দেখতে পান? এমন সময় হযরত কুতুবুদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রহঃ) রূহানী সুরত ধারণ করে শাহ সাহেবের সাথে দেখা দিয়ে একটি ফারছী কবিতার মাধ্যমে জবাব দিলেনঃ

مرا زنده پندار چون خویشتن * بجان آمدم گر تو آی بتن ۔

অর্থ ঃ "তুমি আমাকে তোমার মতই জিন্দা মনে কর। তুমি স্বশরীরে হাজির হলে আমি জান নিয়ে হাজির হবো"। (বজ্‌মে জাম্‌শীদ)

অলীদের মাজার জিয়ারতের নিয়ম ঃ

আল্লামা জালালুদ্দীন সয়ুতি (রহঃ) শরহুস্ সুদুর গ্রন্থে অলীগণের মাজার জিয়ারতের নিয়ম এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

জিয়ারতকারীগণ আল্লাহর অলীর মাজারের পায়ের দিক দিয়ে প্রবেশ করবে। তা সম্ভব না হলে ডানে বা বামে প্রবেশ করবে। তারপর মাজার মুখী হয়ে এবং ক্বেবলাকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রথমে ছালাম আরজ করবে এভাবেঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ.

উচ্চারণঃ "আস্ সালামু আলাইকা ইয়া অলী-আল্লাহ। আস্ সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল ক্বুবুরি মিনাল মুসলিমীনা ওয়াল মুস্‌লিমাতি! আন্‌তুম্ লানা ছালাফুন; ওয়া নাহ্‌নু লাকুম তাবাউন্; ওয়া ইন্না ইন্‌শা আল্লাহু বিকুম লাহিকুন।"

অর্থঃ "হে আল্লাহর অলী! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। হে কবরবাসী মুসলিম নর-নারীগণ! আপনাদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। আপনারা আমাদের পূর্বে গমনকারী। আর আমরা আপনাদের পরে আগমনকারী। আমরা ইন্‌শা আল্লাহ অচিরেই আপনাদের সাথে মিলিত হবো।"

তারপর সুরা ফাতিহা ১বার, সূরা ইখলাস ১১ বার, সুরা কাফিরুন ১ বার, সুরা ফালাক ১বার, সুরা নাছ ১ বার, সুরা জিলজাল ১ বার, সুরা তাকাছুর ১বার, সুরা বাকারার প্রথম তিন আয়াত "মুফলিহুন" পর্যন্ত ১বার এবং সুরা বাক্বারার শেষ তিন আয়াত "আমানার রাছুলু --- থেকে আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন" পর্যন্ত ১বার ও আয়াতুল কুরছি ১বার তিলাওয়াত করবে। সম্ভব হলে ১ বার সুরা ইয়াছিন ও ১বার সুরা আর রাহ্‌মান তিলাওয়াত করবে। দরূদ শরীফ পাঠ করে কবরমূখি হয়ে দোয়া করবে। প্রথমে নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র খেদমতে, তারপর পাক পাঞ্জেতনের সদস্য-বিবি ফাতিমা, হযরত আলী ও ইমাম-হাসান হোসাইন (রাঃ)-এর রূহ পাকে, এরপর উম্মুল মুমিনীনগণের রূহে, এরপর মুহাজির ও আনসারগণ সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের রূহে পাকে, খোলাফায়ে রাশেদীনের রূহে পাকে, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের পবিত্র রূহে, খাস করে গাউসুল আজম বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী, খাজা গরীব নাওয়াজ হযরত মুইনুদ্দীন চিশ্‌তি, হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ, হযরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল-সহ সমস্ত অলী, গাউস, কুতুব, ইমাম,

পীর-মাশায়িখ, এবং নিজের পীর-মুর্শিদ, ওস্তাদ, মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন এবং মুমিনীন মুমিনাতের রূহে উক্ত তিলাওয়াতের সওয়াব পৌছানোর জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাবে। তারপর দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল কামনা করে খাস মকসুদ আল্লাহর দরবারে পেশ করবে এবং এই মহান অলীর উসিলায় যেন ঐ মক্‌সুদ পূর্ণ হয়, তারজন্য দুয়া করবে।

এরপর মাজারস্থ অলীকে লক্ষ্য করে বলবে "হে আল্লাহর অলী! আপনি আল্লাহর মকবুল ও মাহবুব অলী! আমার অমুক মকসুদ পুরনের জন্য আপনি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করুন। নিশ্চয়ই আপনার সুপারিশ আল্লাহ কবুল করবেন। আমার অমুক মকসুদ পুরনে আপনি আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য করুন।"

এইভাবে সাহায্য চাওয়াকে "ইস্‌তিম্‌দাদে রূহানী" বলা হয়। কোরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াছ ও বিভিন্ন বাস্তব ঘটনার দ্বারা এই সাহায্য চাওয়া যায়েজ প্রমানিত এবং বাস্তবে পরীক্ষীত হয়েছে। অত্র কিতাবের ৭নং অধ্যায়ে বর্ণিত বিস্তারিত দলীল পুনরায় দেখুন।

মাজার জিয়ারতকালে কোন্ দিকে মুখকরে মুনাজাত করবে?

কবর বা মাজার জিয়ারতের সময় ক্বেবলাকে পিছনে রেখে কবরকে সামনে করে দোয়া করা মোস্তাহাব। । এর জন্য কিছু দলীল পেশ করে ফতোয়ার সমাপ্তি করা হবে।

১নং দলীলঃ ইমাম মালেক (রহঃ)-এর যুগে (৯০-১৬০ হিজরী আনুমানিক) আব্বাসীয় খলিফা আল্ মনসুর রাজধাণী বাগদাদ হতে হজ্বব্রত পালনের জন্য মক্কায় হজ্ব করে যখন মদিনা শরীফে রওজা মোবারক জিয়ারত করতে আসেন, তখন মদিনাবাসী ইমাম মালেক (রহঃ) কে এব্যাপারে ফতোয়া দিতে বললেন যে, 'জিয়ারতকালে মুনাজাত ক্বেবলামূখী হয়ে করা হবে, নাকি রওজামুখী হয়ে। ইমাম মালেক (রহঃ) জওয়াব দিলেনঃ "ইহা আপনার পূর্ব পুরুষ ও নবীগণের সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (দঃ)-এর রওজা মোবারক। এই রওজা মোবারক খানায়ে কাবা, এমনকি আরশ মুয়াল্লা থেকেও উত্তম। সুতরাং আপনি রওজা মোবারকের দিকে মুখ করেই মুনাজাত করুন"। খলিফা আল মনসুর নত মস্তকে এই ফতোয়া মেনে নেন। খানায়ে

কাবা নামাজের কেবলা। মুনাজাতের কেবলা নয়। আমরা নামাজের নিয়তে বলে থাকি– "মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবা"। অর্থাৎ— আমি কেবলার দিকে মুখ করিলাম। এটা হচ্ছে কা'বার দিকের সম্মান অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম দিকের সম্মান। নবী ও অলীগণের সম্মান কাবার চেয়ে ও অনেকগুন বেশী। কেননা হাকিকতে কাবা হচ্ছে পাথরের তৈরী ঘর। আর হাকিকতে ইন্সান হচ্ছে রূহ। রূহ হচ্ছে নূরের তৈরী। খোদার ঘরের হজ্‌রে আস্ওয়াদকে চুম্বন করা সওয়াবের কাজ; আর নবী ও অলীগণের হস্তপদ চুম্বন করা মোস্তাহাব ও আদবের কাজ। হাকিকতে কাবার চেয়ে হাকিকতে ইনসান উত্তম। কা'বাতে আল্লাহ থাকেন না। কিন্তু মুমিনের কলব হলো খোদার আরশ (তাফসীর রূহুল বয়ান সুরা আল্ ফাতহ)। এজন্যই নামাজ শেষে মুনাজাত করার সময় মুসল্লীদের দিকে মুখ করে মুনাজাত করতে হয় (বাহারে শরীয়ত তরিকুল ইসলাম, আল বাছায়ের প্রভৃতি)।

২নং দলীলঃ দেওন্দের মাওলানা খলিল আহমদ আম্বেটি মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) এর বরাতে লিখেছেনঃ

صرح ايضا خليل احمد الديوبندى نقلا عن الملا على قارى بان الاستقبال وقت الزيارة يكون الى القبر وقال على هذا عملنا وعمل مشائخنا وهكذا حكم الدعاء كما نقل عن الامام المالك رحمه الله حين سأل عنه الخليفة فى هذه المسئلة وصرح به مولانا الجنجوهى فى زبدة المناسك عقائد علماء ديوبند (البصائر لمنكر التوسل باهل المقابر صفحة ـ ٨٨ - ٨٩

উচ্চারণঃ "ছাররাহা আয়জান খলিল আহমদ দেওবন্দী নাক্বলান আনিল মুল্লা আলী আল্ক্বারী বি-আন্নাল ইস্তিক্বালা ওয়াক্তাজ জিয়ারাতি ইয়াকুনু ইলাল ক্ববরি। ওয়া ক্বালা আলা হাজা আমালুনা ওয়া আমালু মাশায়িখিনা। ওয়া হাকাজা হুক্মুদ দোয়াই কামা নুক্বিলা আনিল ইমামিল মালিক রাহিমাহুল্লাহু হীনা ছা- আলা আন্হুল্ খলিফাতু ফি হাজিহিল মাছ্আলাতি। ওয়া ছাররাহা বিহি মাওলানাল জান্জুহী ফি 'জুব্দাতিল মানাসিকে' আক্বাইদা উলামায়ে দেওবন্দ"। (আল বাছায়ের লি মুন্কারিত তাওয়াচ্ছুলি বি আহলিল্ মাক্বাবির-পৃঃ ৮৮-৮৯)।

অর্থঃ "খলিল আহমদ আম্বেটি মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন যে, জিয়ারতের সময় মুখ কবরের দিকে থাকবে। তিনি আরো বলেছেন যে, ইহাই আমাদের আমল এবং আমাদের দেওবন্দের মাশায়িখগণের ও আমল। দোয়ার সময়েও একই হুকুম অর্থাৎ-কবরমুখী হয়ে দোয়া করা। যেমন, ইমাম মালেক (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে– যখন খলিফা (আল-মনসুর) ইমাম মালেককে রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর রওজা মোবারক জিয়ারতকালে ও দুয়ার সময় মুখ কোন্দিকে থাকবে-এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছিলেন– রওজা শরীফের দিকে। মাওলানা গাঙ্গুহী তাঁর জুব্দাতুল মানাসিক' গ্রন্থে দেওবন্দের ওলামাগণের আক্বিদা এ ক্ষেত্রে অনুরূপই বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।" (আল বাছায়ের লি মুন্কারিত তাওয়াচ্ছুলে বি আহ্লিল মাক্বাবির পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯-কৃত আল্লামা হামদুল্লাহ দাজুভী সাহারান পুরী)।

৩নং দলীলঃ কবর জিয়ারতের সময় এবং দোয়ার সময় মুখ কবর মুখী হওয়া সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) হতে ও বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা দাজুভীর উক্ত গ্রন্থের ৮৯ পৃষ্ঠায় ৪র্থ লাইনে বর্ণিত হয়েছেঃ

فعلمت من النقل المذكور ان الاستقبال الى القبر اولى مطلقا عند ابى حنيفة رح ـ

উচ্চারণঃ ফা আলিম্তা মিনান নাক্লিল মাজ্কুরি আন্নাল ইস্তিক্বালা ইলাল ক্বাবারি আওলা মুত্লাকান ইন্দা আবি হানিফাতা রাহিমাহুল্লাহ"।

অর্থঃ "হে পাঠক! মোল্লা আলী ক্বারী ও ইমাম মালেক (রহঃ)-এর বর্ণিত এবারতের দ্বারা আপনি পরিস্কারভাবে অবগত হতে পারলেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে কোন শর্ত ছাড়াই সর্বাবস্থায় (জিয়ারত ও দোয়া) কবরের দিকে মুখ করে দাড়ানোই উত্তম।" (আল বাছায়ের পৃঃ ৮৯)।

উপরোক্ত পর্য্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, কবর জিয়ারত কালে কবরের দিকে মুখ করে দুয়া ও মুনাজাত করা শুধু আহ্লে সুন্নাতের আক্বিদা নয়, বরং যারা ওহাবী নামে খ্যাত, তাদের আকাবেরীনে উলামায়ে দেওবন্দ-এর মতেও উত্তম এবং তাদের আমলও অনুরূপ ছিল। এরপর ও যদি কেউ এ ব্যাপারে তর্ক করে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

الحق احق ان يتبع به و الخير فيه.

অর্থঃ সত্যের অনুসরন বাঞ্ছনীয় এবং এতেই মঙ্গল নিহিত।